আলোক লগ্ন

মিহির সেন

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

বাবা ও মাকে

এই লেখকের :

প্রবেশ নিষেধ (নাটক)

আলোক
লগ্ন

এই ভয়ই করছিল স্বদেশ, হয়তো শেষপর্যন্ত ওরও ডাক পরবে।

কাল সারাদিন জলভরা মেঘে আকাশ ভারী ছিল। থেকে থেকে দু-এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছিল। দমকা দু-এক ঝাক বাতাসে ঝড়ের আভাস থাকলেও ঝড় হয়নি। সন্দেহ করেছিল স্বদেশ, হয়তো কোথাও ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সে ঝড় যে নদীয়ার বুকে এমন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল আজ সকালে পত্রিকা না পড়া পর্যন্ত তা ভাবতেও পারেনি।

অফিসে এসেই টের পেল, তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। আজ ভোরেই নাকি প্রথম দলটা বেরিয়ে গেছে। অফিসারের টেবিলে দ্বিতীয় দলের তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। মনে মনে ভয় পেল স্বদেশ, হয়তো ওর নাম এ তালিকা এড়িয়ে যেতে পারবেনা। ভয় ওর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাবার জন্য নয়। ভয় অনুকে। যে ভয় অফিসারের টেবিলে আপত্তি হিসেবে পেশ করা যায় না। যে ভয় দিয়ে আদেশ এলে তাকে নাকচ করা যায় না।

সত্যিই যখন বেলা পাঁচটার মুখে আদেশটা এল তখন বিনা প্রতিবাদে সেটা সই করে গ্রহণ করল স্বদেশ। নানা অজুহাতের মালা গেঁথে অনেকের মত অফিসারের কাছে হাজির হল না। পুরু লেন্সের ফাঁক দিয়ে একবার শুধু পড়ে দেখল নোটিশটা। দ্বিতীর পার্টি হিসেবে কাল ভোরেই ওদের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যেতে হবে। তারপর অন্যমনস্কে বসে বসে ভাঁজ করতে লাগল কাগজটা। আর পাঁচটার সময় রোজের মতই নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এর পরের অধ্যায়টুকু জানা স্বদেশের। এবার বাড়ী ফিরবে। তারপর এই প্রসঙ্গ নিয়ে অনুর মুখোমুখি হতে হবে। এবং কিছু অনুযোগ, কিছু ব্যাঙ্গ, কিছু শ্লেষের সম্মুখীন হতে হবে। তবু কিছু জবাব দেবেনা ও। শুধু শুনে যাবে। ওর এ নীরব সহনশীলতায় চটে যাবে অনু, জানে। তবুও প্রতিবাদ করবে না কারণ তাতেও চটবে অনু। আরো চটবে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই সব পুরোন দিনের স্মৃতিকে উস্‌কিয়ে তুলবে, যাদের ভুলে থাকতে চায় স্বদেশ। যে স্মৃতিগুলো শুধু ওর যন্ত্রণা বাড়ায়। মনের

ভারসাম্য নষ্ট করে। অথচ অনুরও কোন উপকার হয় না তাতে। বরং আবার অসুস্থ হয়। হয়তো একদিন, দুদিন, তিনদিন অজ্ঞান হয়ে থাকে। আর অচেতন অনুর সামনে দাঁড়িয়ে অন্তর্দাহে জ্বলে স্বদেশ, ফুলের মত মেয়েটাকে আমিই বোধ হয় দলে পিষে শেষ করলাম!

বাড়ীতে ঢোকার মুখে আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করে নিল স্বদেশ। সন্তর্পণে দরজায় টোকা দিল। অনু এসে দরজা খুলে দিল। বুঝল ও, পূজোর ঘরে ছিল অনু।

নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে দরজার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরে অনুকে দেখল স্বদেশ। অনু আসনে বসে পূজোর আয়োজনে তন্ময়। অথচ ওর বয়সী মেয়েরা, যাদের ছেলেমেয়ের ঝামেলা নেই ওর মত, সংসারের বন্ধন নেই, তারা এখন স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় চটুল চাউনি মেলে দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়। অথবা স্বামীর সঙ্গে সেজেগুজে বেড়াতে বেরোয়। পার্কে, সিনেমায় অথবা আত্মীয় বাড়ী।

স্বদেশ হাত মুখ ধুয়ে এসে নিজেকে এলিয়ে দিল ইজি চেয়ারে। ঘরের সবুজ হাল্কা আলোটা জ্বালিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ বাদে পূজো সেরে স্বদেশের জন্য চা নিয়ে এল অনু। নিঃশব্দে টেবিলের উপর চা আর খাবারের প্লেটটা রেখে রান্না ঘরে ফিরে গেল। নিজের জন্য এক কাপ চা ঢেলে নিল। আর দুটো কাপে দুকাপ দুধ। এ বাড়ীর একমাত্র পুষ্যি বিড়াল দুটোর জন্য।

স্বদেশ ঠিক সুযোগ পেলনা কথাটা চায়ের টেবিলে পরিবেশন করতে। অগত্যা অপেক্ষা করতে হল রাত্রের জন্য।

রাত্রে খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গীতে একসময় বলল, ভালকথা, কাল সকালে দিন কয়েকের জন্য আমার অফিসের কাজে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে অনু। আমি দিদির বাড়ী খবর দিয়ে যাব'খন অন্তত নন্তু কাউকে রাত্রে এসে থাকবার জন্য।

অনু বলল, দরকার নেই। আশেপাশে সব ঘরেইতো লোক আছে। কোথায় যাচ্ছ?

—নদীয়ার ওদিকে।

অনু চোখ তুলে তাকাল, বন্যাত্রাণে ?

চোখ নামাল স্বদেশ, হ্যাঁ, অফিসে হঠৎ জরুরী অর্ডার এল বেরুনর মুখে। একবার ভেবেছিলাম আপত্তি করব, কিন্তু—

অনু একটু হেসে বলল, আমতা আমতা করছ কেন ? এতো দেশের কাজ, তোমার সেই মহান ব্রত, যাবে বৈকি।

স্বদেশ চুপ করে থাকল। এসব ক্ষেত্রে আজকাল চুপ করেই থাকে ও। ফেলে আসা প্রথম জীবনের দিনগুলো হলে উল্টো ধমকাতো অনুকে। শ্লেষ দিয়ে কথা বলে লজ্জা দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে সব ফেলে আসা দিনই। এদিন নয়।

খাওয়া শেষ করে উঠতে যাচ্ছিল স্বদেশ। অনু নিজের ভাত বাড়তে বাড়তে স্মিত হেসে বলল, আচ্ছা, ওখানে বসে যদি হঠাৎ সংবাদ পাও যে বিরাট ভূমিকম্পে কলিকাতা তছনছ হয়ে গেছে, আমরা সব চরম বিপর্য্যয়ের ভেতর দিন কাটাচ্ছি, তুমি আসবে আমাদের ত্রাণ করতে ?

স্বদেশ একটু জোর করে হাসল, কিযে বল তুমি !

অনু গম্ভীর হল, বলনা, আমার মাঝে মাঝে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।

স্বদেশ কোন জবাব না দিয়েই উঠে গেল। যেতে যেতে শুনল অনু বলছে, আমি জানি তুমি আসবেনা। ঘরের সেবায় যে নাম নেই, যশ নেই। কাগজে কাগজে হাততালি আর ছবি নেই। তাই না ?

স্বদেশের ইচ্ছে হল একবার ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু দাঁড়ালনা। তাতে লাভ নেই। কেবল ক্ষতি। ক্ষতি ওর। ক্ষতি অনুর। ক্ষতি ওদের এক ছাদের তলে থাকা দাম্পত্য জীবনের।

নিঃশব্দে কলতলায় গিয়ে আঁচিয়ে ঘরে চলে গেল স্বদেশ, আবার ইজি চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিল। যা গোছগাছ করার কাল সকালে করলেই চলবে।

বন্যার এরূপ নতুন নয় স্বদেশের কাছে।

শুধু বন্যা নয়, বন্যা মহামারী, অগ্নি-তাণ্ডব—মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি-

মিনি খেলা প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে পরিচিত স্বদেশ। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে এদের মোকাবিলা করেছে ও। তাই অহেতুক কোন উদ্বেগ অনুভব করে না আর এসবের সামনে দাঁড়িয়ে। আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে না। বরং কিছুটা নিরাসক্ত দার্শনিকের মত নিস্পৃহ মনে হয় নিজেকে।

আবেগ অনুভব করে না, কিন্তু প্রতীক খুঁজে পায়। বন্যার সর্ব্বগ্রাসী জলের বিস্তার দেখে মাঝে মাঝে নিজের জীবনের প্রতীক খুঁজে পায় স্বদেশ। ওরও জীবনের বাঁচার আশ্রয়—স্বপ্ন, সাধ, আদর্শ আর সুস্থ জীবন-দর্শনের খেলাঘরগুলো কি করে যেন এক সংজ্ঞাতীত বন্যার তাণ্ডবে চোখের সামনে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কিছু সহানুভূতি, কিছু অনুকম্পা, কিছু দয়ার ভেলায় করে ওদের তুলে আনা হল বন্যার বাইরে। তারপর ঢাকঢোল পিটিয়ে ওদের মাটিতে পৌঁছে দেবার ঘোষনা ছড়িয়ে দেওয়া হল চারদিকে। নেতারা প্রীত হল। কিছু স্বার্থান্বেষী লোক স্ফীত হল। কিন্তু ওরা আর সেই বন্যায় তলিয়ে যাওয়া নীড় খুজে পেলনা। স্টেশনে বসে সীমাহীন জলের দিকে তাকিয়ে এসব কথাই ভাবছিল স্বদেশ। হঠাৎ চমক ভাঙ্গল সামনের ডাকে।

—আরে. স্বদেশদা যে? এসো এসো। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর।

সামনের একটা লাইটপোষ্টে নৌকা বাঁধতে বাঁধতে উদাত্ত আহ্বান জানাল আনন্দ। ডাঃ আনন্দ বোস।

অন্য কেউ হলে অবাক হত। এই শ্মশানে দাঁড়িয়ে এ-উচ্ছাসকে হৃদয়হীনতার পর্যায়ে ফেলত কিন্তু স্বদেশ ওকে ভাল করে চেনে বলেই অবাক হল না। জানে স্বদেশ, ওর আসল অনুভূতির ফল্গু গুমরে মরছে এই আপাত উচ্ছাসের তলে।

ততক্ষণে দলের আর সবাই মালপত্র তুলতে শুরু করেছে নৌকায়। মাল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ সংগ্রহ করছে ওরা। সুবিধা অসুবিধার তালিকা তৈরী করে নিয়ে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে আসন্ন সংগ্রামের জন্য। সকলেরই মুখে চোখে অসন্তুষ্টির ছাপ। কলকাতার শুকনো নিরাপদ মাটি থেকে এই অথৈ জলে ঠেলে ফেলার জন্য।

আনন্দ হাসতে হাসতে এগিয়ে এল স্বদেশের দিকে।—কি দাদা পার পেলেনা তাহলে ?

একটু হাসল স্বদেশ, পার পেতে তো চাইনি কোনদিন। তারপর অবস্থা কি রকম বুঝছ ?

হাসিটা পরিমাপে একটু ছোট হল আনন্দর। তবু আবৃত্তির ভঙ্গীতে বলল, জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।

স্বদেশ তাকাল ওর দিকে, সঙ্গে টেথিসকোপটাও এনেছ তো মনে করে ?

এবার গম্ভীর হল আনন্দ। বলল, সত্যি স্বদেশদা, সঞ্চয়িতাটা সঙ্গে এনেছিলাম, না-হলে এই অসহায় মৃত্যু আর হাহাকারের মধ্যে নিরুপায় দর্শকের মত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে পাগল হয়ে যেতাম বোধ হয়। চল নিজের চোখেই দেখতে পাবে, কি রিলিফ্ দিয়ে হতভাগ্য-গুলোকে বাঁচানর চেষ্টা করছি। এ প্রহসনের কোন মানে হয় না স্বদেশদা।

আসল আনন্দর মুখোমুখি হল এবার স্বদেশ। মাল তোলা পর্ব শেষ হয়েছে ততক্ষণে। আনন্দকে নিয়ে স্বদেশ গিয়ে নৌকায় উঠল। ক্যাম্পে পৌঁছেই পাগলের মত কাজে লেগে গেল আনন্দ। নতুন আসা পার্টি জিনিষ-পত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্বল্প পরিসর সেই অস্থায়ী অস্তানার ভেতরই সুবিধে মত জায়গা বেছে নেবার অঘোষিত প্রতিযোগীতায় মত্ত হয়ে উঠল সদ্য আসা স্বার্থগুলো। মনে মনে হসল স্বদেশ। সেবা আদর্শ না হয়ে জীবিকা হলে বোধ হয় এই-ই হয়। কিড ব্যাগটা এককোনে ঝুলিয়ে রেখে আস্তে বেরিয়ে পড়ল ও। চারদিকের অবস্থাটা একবার দেখে শুনে নেওয়া প্রয়োজন।

কিছুটা ঘুরেই টের পেল স্বদেশ কাগজে পড়ে যা ভেবে এসেছিল, অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ। পুরো গ্রামটাই, শুধু গ্রামটাই বা কেন, পুরো অঞ্চলটাই বন্যায় চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। জলের উপর আগাছার মত মাথা তুলে আছে বড় বড় গাছের মাথা। বাড়ীর চাল, বেড়া, ভাঙ্গা গাছের ডাল, মরা গরু-ছাগল অবিরাম গতিতে ভেসে চলেছে চোখের সামনে দিয়ে। নৌকা করে আশেপাশের গ্রাম থেকে উদ্ধার করে আনা হচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত লোক-

গুলোকে। এসব বিপর্যয় আজকাল কেন যেন আর খুব বিচলিত করেনা স্বদেশকে। তরুণ বয়সের মত আবেগে উদ্বেল করে তোলেনা। নিজেকে পর্য্যালোচনা করে ঠিক বোঝেনা ও, অনুভূতির এ শীতলতা কি বয়সেরই অনস্বীকার্য পরিণতি, নাকি একা স্বদেশেরই হৃদয়হীনতা এটা। বেশ বোঝে নিজের পারিবারিক জীবনেও কেমন যেন দিনদিন নিস্পৃহ হয়ে উঠছে স্বদেশ। কোন কিছুতেই বিরাট দুঃখ, বিরাট আনন্দ অনুভব করেনা আর আজকাল। কোন কিছুতেই ভীষণ আশ্চর্য হয় না। কিন্তু কি বিরাট একটা যন্ত্রণার যুগ পেরিয়ে এগোচ্ছে পৃথিবী তা জানে স্বদেশ। জানে বলেই কি আজ ও নিজের নিস্পৃহ অনুভূতি নিয়ে এমন নিঃসঙ্গ ! কে জানে।

—স্বদেশবাবু, ও স্বদেশবাবু।

পেছন ডাকে চমক ভাঙ্গে স্বদেশের। ফিরে তাকায়। তপন ডাকছে।

সামনে এগিয়ে আসতে আসতে অনুযোগের সুরে বলল তপন, কি ব্যাপার ? একেবারে ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিলেন মনে হয়। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে যাবার উপক্রম। চলুন, চা হয়েছে।

অফিসের সর্ব কনিষ্ঠ কর্ম্মী তপন বিশিষ্ট ওর তরল আবেগের জন্য। স্বপ্ন-বিলাসী মনের জন্য। অতি অল্পে বিচলিত হয় ও। অতি অল্পে ভীষণ খুশী হয়। দারুন দুঃখিত হয়। আশ্চর্য হবার ক্ষমতা ওর অসীম। সদ্য কৈশোর পেরিয়ে আসা তপন তাই অফিসে সকলের আমোদের কেন্দ্র। স্নেহের পাত্র।

আড়চোখে একবার তপনকে দেখে নিয়ে নির্লিপ্তস্বরে বলল স্বদেশ, পূর্ব বাংলার ছেলে তো, বহুদিন পর এক সঙ্গে অনেকটা জল দেখে বেশ কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিলাম আর কি। বেশ লাগছিল।

আর পাঁচ জন থেকে স্বদেশকে একটু আলাদা ওর প্রথম থেকেই মনে হত, কিন্তু ওর তার বেশী পরিচয় জানেনা তপন। স্বদেশের কথায় একটু ক্ষুণ্ণ হল তপন। বলল, বেশ খুসী হয়েছেন মনে হচ্ছে ?

তপনকে চটানর জন্যই বলল স্বদেশ, তা একটু হয়েছি বৈকি। বারে বারে দেশের কথা মনে পড়ছে।

তপন এবার আহত হল। বলল, আশ্চর্য ! এদিকে রোম পুড়ছে আর আপনি বসে বেহালা বাজাচ্ছেন !

কথা বলতে বলতে ক্যাম্পে পৌছে গিয়েছিল ওরা। ভেতরে ঢোকার

মুখে একটু হেসে বলল স্বদেশ, সেটাওতো শিল্পীর তন্ময়তার প্রতীক তপন। নিন্দে করছ কেন?

তপন কোন উত্তর দিলনা। চরম একটা বিরক্তির রেখা ফুটল চোখেমুখে। সোজা ভেতরে ঢুকে গেল তপন।

ক্যাম্প থেকে বেরুচ্ছিল আনন্দ। মুখোমুখি হয়ে গেল স্বদেশের। একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, তপন একটু বিরক্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল মনে হচ্ছে।

স্বদেশ গম্ভীর হয়েই বলল, এত জল দেখে বেশ আনন্দ হচ্ছে শুনে একটু ব্যথা পেয়েছে বেচারা।

আনন্দ হাসল, ও এই! যাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বোধহয়।

স্বদেশের যে রূপটার সঙ্গে পরিচিত ছিলনা তপন, তার সঙ্গে পরিচিত হল সেদিন বিকেল থেকেই। বিশাল সমুদ্রে নিঃসঙ্গ একটা ডিঙ্গির মত সবার অলক্ষ্যে কাজে নেমে গেল যেন স্বদেশ। নিঃশব্দ নিস্পৃহ সে কাজের রূপ আলাদা। রং আলাদা। চোখে আঙ্গুল দিয়ে আর সবার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ঠিক দেখিয়ে দেওয়া যায় না হয়তো সেটা কিন্তু অনুভব করা যায়। অন্ততঃ তপন পারল।

আর আনন্দ। এসব মুহূর্তে আনন্দ সত্যিই মনে মনে খুশী হয়। হারিয়ে ফেলা স্বদেশদাকে যেন নিজের রূপে খুঁজে পায়। অন্তত এই ভেবে খুশী হয় যে, কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও লোকটা অন্তর্দাহের আঁচ থেকে কিছুটা দূরে সরে আছে। নিরাসক্ত মুহূর্তের ধূ-ধূ মরুর ভেতর অন্ততঃ সাময়িক একটা আসক্তি উদ্যান পেয়েছে।

তপন সকালের ব্যবহারের জন্য একটু লজ্জা পেয়েছিল বোধহয়, স্বদেশকে একটু আড়ালে খুঁজছিল। কিন্তু খবর নিয়ে জানল, গ্রাম থেকে তখনও ক্যাম্পে ফেরেনি স্বদেশ।

স্বদেশকে পেলনা, পেল আনন্দ ডাক্তারকে। ক্যাম্পের এক কোনে ব্যাগ থেকে দু-তিনটা শিশি বের করে একটা ওষুধ তৈরী করছিল আনন্দ। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল তপন, স্বদেশবাবু আসেন নি এখনও?

আনন্দ চোখ না তুলেই মাথা নেড়ে জানাল, দেখছি না-তো। কিন্তু এরপর অন্ধকারে ফিরতে অসুবিধে হবে।

চা খেতে খেতে কোণ থেকে জবাব দিল আর একজন সহকর্মী, সত্যি, চাকরী করছেন বটে স্বদেশবাবু। নাওয়া খাওয়ার পর্যন্ত সময় পাচ্ছে না।

আনন্দ এবার চোখ তুলল। আড় চোখে তাকিয়ে দেখে নিল একবার বক্তাকে। তারপর নিবিষ্ট মনে ওষুধটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, মিঃ দাসগুপ্ত, মানুষের সঙ্গে এই ওষুধটার তফাৎ কোথায় বলতে পারেন?

দাশগুপ্ত একটু অবাক হয়ে বলল, এটা প্রশ্ন না ধাঁধাঁ?

আনন্দ একটু হাসল, পারলেন না? ওষুধটাকে এখনই পরীক্ষা করে নিখুঁতভাবে বলে দেওয়া যায় এর ভেতর কত পারসেণ্ট কি আছে। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে কোনদিনই সেটা বলা যায় না বোধহয়।

দাশগুপ্ত একটু ক্ষুণ্ণ হল, কথাটা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন? স্বদেশবাবু সম্বন্ধে আমি—

বাধা দিল আনন্দ, আমিও ডেফিনিট্‌লি স্বদেশদার কথাই বলছিনা। তবে একটা কথা কি জানেন, আমাদের দেশে কাজের অতি উৎসাহকে অনেক সময়ই একটু বাঁকা চোখে দেখা হয়। স্বদেশদা এ-চাকরি করছেন মাত্র ক'বছর, কিন্তু একাজ করছেন উনি সেই ছাত্রজীবন থেকেই। এক গ্রামের ছেলে হিসেবে সেটা আমি জানি বলেই বললাম।

আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠল। দাশগুপ্ত লজ্জিত হল। সত্যিই কিছু ভেবে বলেনি সে, এমনিই বলে ফেলেছিল। দাশগুপ্তের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার লজ্জিত হল আনন্দ। ছোট অতটুকু একটা মন্তব্যের জন্য এত কথা না বললেও বোধহয় পারত।

ওষুধটা ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল আনন্দ, কিছু মনে করবেন না, কাউকে আঘাত দেবার জন্য এসব কথা বলিনি আমি। আপনারা বোধ হয় জানেন না, জানার কথাও নয় অবশ্য, এই বন্যার সঙ্গে স্বদেশদার ব্যক্তিগত জীবনের একটা বিরাট ট্যাজেডিও জড়িয়ে আছে। রিয়ালি আই ফিল্ ফর হিম্।

ওষুধটা নিয়ে আস্তে বেরিয়ে যায় আনন্দ।

এ আলোচনার কেন্দ্র স্বদেশ তখন ক্যাম্প থেকে অনেক দূরের একটা

গ্রাম থেকে কিছু লোকজন উদ্ধার করে ভেলায় করে ফিরছিল। সন্ধ্যার কালিমাখা অথৈ কালো জলের বুক চিড়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল ভেলাটা। হাঁটুর খাঁজে মুখ রেখে অন্যমনস্কে সামনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল স্বদেশ। চোখের দৃষ্টিতে বিষন্নতার ছায়া। বসে বসে ভাবছিল বহুদিন আগে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। সেই আচমকা ঝড়ের রাতের কথা। যে ঝড় ওর অজ্ঞাতে ওর নীড় ভেঙ্গে ছিল। যে নীড় আর জীবনে গড়তে পারল না ও, জীবনে আর কোনদিন পারবেও না। লাখপতি হলেও না।

সামনে কালো কালো দুচোখ জড়ান জল আর স্মৃতি। লগি-ভাঙ্গা ছোট ছোট ঢেউগুলো অথৈ স্মৃতির দিঘিতে অবিরাম ছোট ছোট ঢেউ তুলে যাচ্ছিল। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন স্মৃতি-ঢেউ। কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। নিঃসংযোগ, কিন্তু নিবিড় সে স্মৃতি।

পদ্মার ঢেউ। ছবির মত গ্রাম। সুখে দুঃখে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলো। টিনের চালের স্কুল। সেবা সমিতি। স্বদেশী আন্দোলন। আর, আর···
···অনু এখন কি করছে? হঠাৎ মনে পড়ল স্বদেশের, অনু এখন কি করছে? পূজো করছে? না-কি পুষি দুটোকে দুধ খাওয়াচ্ছে? বিড়াল আর কতদিন বাঁচে? ওরা মরে যাবে। তারপর? তারপর কাকে দুধ খাওয়াবে অনু! কাকে নিয়ে ওর দিন কাটবে? একবার খরগোস কিনতে চেয়েছিল, কিনে দিলেই পারত। দেয়নি ঘরদোর নোংরা করবে বলে। বিড়াল দুটো খেয়ে ফেলবে ভয়ে। অথচ বিয়ের পর এই অনুই শ্বশুরবাড়ী এসে পোষা খরগোসটাকে বিদায় করার জন্য কি ব্যস্তই না হয়ে উঠেছিল। মানুষ কত পাল্টায়। স্বদেশও কি পাল্টায় নি? একটা কান্নার শব্দ না।

ভেলার লোকজন চোখ চাওয়া চাউয়ি করল। হ্যাঁ, কান্নাই। বাচ্চার কান্না। স্বদেশেরও কানে গেল সেটা।

একজন কথা বলল এবার, বাচ্চার কান্না বলে মনে হচ্ছে না?

সায় দিল সকলেই। কিন্তু বুঝতে পারল না, এখানে, এই নিঃসীম জলের ভেতর কাঁদবে কে! চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল সকলে।

বুড়োমত একজন বলল, ভোঁদরের কান্নার মত মনে হচ্ছে।

কিন্তু ভোঁদরই বা এখানে আসবে কোত্থেকে ?

আর একজন বলল, শকুনের কান্নাও কিন্তু অনেক সময় মানুষের কান্নার মত শোনায়।

কেউ একথার উত্তর দিল না। কান পেতে শুনতে লাগল কান্নাটা।

স্বদেশ আস্তে উঠে দাঁড়াল ভেলার উপর। সন্ধানী দৃষ্টিতে সামনে ভেসে চলা বটগাছের ঝাপড়া ডালটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। মনে হল কালোমত কি যেন একটা ভেসে চলেছে ডালটার সঙ্গে। কান্নাটাও ওদিক থেকেই আসছে।

চোখ না ফিরিয়েই স্বদেশ বলল, ভেলাটা ওদিকে নিয়ে চলতো।

ভেলা মুখ ফেরাল। আস্তে গিয়ে বটগাছের ডালটার সঙ্গে লাগল। কালো জিনিসটাকে চেনা গেল এবার। বিরাট একটা মাটির জালা। টেনে-টুনে জালাটাকে এলোমেলো ডালের ভেতর থেকে বের করল সবাই মিলে। আর কান্নাটাকেও পাওয়া গেল তারই ভেতর। প্রায় অচেতন একটি বাচ্চা একটানা গোঁঙ্গিয়ে চলেছে জালাটার বুকে।

সন্তর্পণে স্বদেশ দুহাতে তুলে নিল ওকে। লণ্ঠনটার সামনে তুলে ধরল। ফুটফুটে অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ে। ভীতি বিহ্বল। প্রায় অচেতন।

মানুষের হাতের ছোঁয়া পেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল মেয়েটা। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্বদেশের দিকে। সমস্ত চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে কি যেন খুঁজল ওর চোখে। তারপর হঠাৎ চেতনা হারিয়ে ঢলে পড়ল স্বদেশের হাতের ভিতর।

আপ্রাণ গতিতে ভেলা ভেসে চলল ক্যাম্পের দিকে।

ক্যাম্পে ফিরে মেয়েটাকে আনন্দর হাতে তুলে দিয়ে দায় মুক্ত হল স্বদেশ। আনন্দ তাড়াতাড়ি ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। নাড়ীর স্পন্দন দেখল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকসন্ বের করে আনল।

ক্যাম্পের সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিছানার কাছে। উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। সবার পিছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল স্বদেশ।

আনন্দ ইঞ্জেকসনটা করে উঠে দাঁড়াল। আস্তে বলল, সে রকম

ভয়ের কিছু নেই। বাচ্চাতো, নার্ভের উপর খুব স্ট্রেইন পড়েছিল আর কি। আজ রাতটা টেনে ঘুমোতে পারলেই কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্লান্ত স্বদেশ নিঃশব্দে এগিয়ে এল ভীড়ের পেছন থেকে। বিছানাটি পেতে নিজেকে এলিয়ে দিল বিছানার উপর।

পরদিন ভোরে উঠে সবাই দেখল মেয়েটা তখনও নিঃসারে ঘুমোচ্ছে।

স্বদেশ আনন্দের সঙ্গে ওর অস্থায়ী ডিস্পেন্সারী ভাঙ্গা ক্লাবঘরটায় বসে মেয়েটি প্রসঙ্গেই আলোচনা করছিল। হঠাৎ তপন ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

—স্বদেশবাবু তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে চলুন, বাচ্চাটা উঠে ভীষণ গোলমাল করছে।

স্বদেশ জিজ্ঞেস করল, কিছু খেতে দিয়ে দেখেছিলে?

তপন বলল, দিয়েছিলাম, কিন্তু খায়নি। হাত-পা ছুঁড়ে কেবল কাঁদছে।

কিছুটা বিব্রত বোধ করল স্বদেশ। বলল, তাহলে আর আমি গিয়ে কি করব? কেউ না পারলে কি আর আমি থামাতে পারব? বরং আনন্দ একবার গিয়ে দেখ।

তপন হেসে বলল, ছেলেপুলে বশ করতে পারার রীতিমত একটা সুনাম আছে আমার, কিন্তু আমি পর্যন্ত ফেল পড়ে গেছি।

আনন্দ বুঝল স্বদেশ কেন যেতে চাচ্ছে না। ছেলেপুলের ঝামেলা কোনদিনই সেরকম পোয়াতে হয়নি ওর। সেদিক দিয়ে কিছুটা অপটু স্বদেশ। তবু বলল, চলনা দু'জনেই যাই।

ক্যাম্পের বাইরে থেকেই শান্তি সেনাদের ব্যর্থ-ঐকতান কানে এল ওদের। ভেতরে ঢুকে দেখল, হাত পা ছুঁড়ে তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে মেয়েটা। চারপাশে ঘিরে রয়েছে সবাই। কেউ কৌটো বাজাচ্ছে, কেউ সুটকেস্, কেউবা থালা বাটি। দু-চার জন দুধ বিস্কুট নিয়েও প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। কিন্তু সমস্ত শান্তি প্রস্তাবই পত্রপাঠ নাকচ হয়ে ফিরে আসছে।

আনন্দ মেয়েটার সামনে এগিয়ে গেল। অনেক রকম চেষ্টা করে দেখল থামাবার। কিন্তু বৃথা। অগত্যা এক নতুন পথ বেছে নিল আনন্দ। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে-থাকা স্বদেশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে

আচমকা একটা চড় মেরে বসল মেয়েটাকে। থমকে থেমে গেল মেয়েটা। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। হতভম্ব দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আনন্দের দিকে। অভিমানে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল ঠোঁট দুটো। তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

আনন্দ উঠে ক্যাম্পের বাইরে যেতে যেতে ফিসফিস করে স্বদেশকে বলে গেল, এবার একটু আদর করে দেখতো।

স্বদেশ ইতস্তত করল। মুখচোখ দেখে বোঝা গেল এ নতুন ঝামেলায় জড়িতে পড়তে আদৌ ইচ্ছুক নয় ও। তবু উপায় নেই দেখে এগিয়ে গেল। গিয়ে আদর করে কোলে তুলে নিল মেয়েটাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, আহা ষাট্, তোমাকে মেরেছে? দাঁড়াও আমি ওকে মেরে দেব। কাঁদে না।

এ অভিনয়ে ফল হল। কাঁদতে কাঁদতেও একটা ছোট্ট আশ্রয় খুঁজে পাওয়া দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ও স্বদেশকে। স্বদেশ ওকে কোলে নিয়ে বাইরে চলে এল। বলল, চলত দেখি কে তোমাকে মেরেছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাইরে পায়চারী করে আবোল তাবোল বকে শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে শান্ত করল স্বদেশ।

তারপর কথায় কথায় ওর পরিচয়টা জানবার চেষ্টা করল। কিন্তু আংশিক নামটা ছাড়া ওর আধোআধো বিবরণ থেকে আর কিছুই সে-রকম পরিষ্কার বোঝা গেল না। অন্তত উপাধিটা জানতে পারলেও তবু একটা সূত্র পাওয়া যায় ভেবে আর একবার নানান কথার পর জিজ্ঞেস করল স্বদেশ, এই যাঃ, তোমার নামটা যে ভুলে গেলাম। কি যেন নামটা?

আস্তে বলল ও, ছিমা।

—সীমা? বাঃ বেশ নামতো। সীমা কি?

একটু ভেবে জবাব দিল ও, আছিমা।

বুঝল স্বদেশ এর বেশী আর বলতে পারবে না ও। কথার আট সাট দেখে এমনিতে বেশ চালাক চতুর বলেই মনে হয়, কিন্তু এসবগুলো আদৌ বোধহয় শেখানই হয়নি ওকে। দোষটা ওর নয়। ওর মা-বাবার।

মা বাবার কথা মনে পড়তেই নতুন করে এবার দায়িত্বটার কথা অনুভব

করল। এই বিশৃঙ্খলার ভেতর এই আর এক নতুন সমস্যা এসে ঘাড়ে চাপল।

স্বদেশের দিকে তাকিয়ে একটু আবদারের সুরে বলল সীমা, দুদু কাব না?

স্বদেশের মনে পড়ল ওর খাওয়া হয়নি। বলল, চল খাবে।

ক্যাম্পের মুখেই আনন্দের সঙ্গে দেখা। আনন্দকে দেখে ভুরু কুঁচকে সীমা নিজের অজান্তেই দুহাত দিয়ে স্বদেশের গলাটা আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল স্বদেশ। নরম হাতদুটোর স্পর্শ যেন ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে দিল ওকে। একটা বিস্মৃত অতীত চোখের সামনে ঝিলিক মেরে গেল। ওকে কোল থেকে নামিয়ে বলল স্বদেশ, চল, ভেতরে চল।

আনন্দ একটু হাসল, কৃতিত্বটা কিন্তু ডাক্তারেরই প্রাপ্য। কেমন প্রেস্‌ক্রিপসনটি দিয়েছিলাম!

স্বদেশ কোন জবাব দিলনা। আস্তে সীমাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

সেদিন বিকেলেই সীমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল স্বদেশ, খোঁজ খবর নিতে। অবশ্য প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল ওর, এত সহজে কোন সুরাহা করে উঠতে পারবে না হয়তো। গ্রামের লোক যাদের সঙ্গে দেখা হল সবার কাছ থেকেই সেই একই উত্তর পেল, ঠিক চিনতে পারছিনা। আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

শেষ পর্যন্ত সীমাকে নিয়ে থানায় গিয়ে হাজির হল স্বদেশ। ওঁদের অনেক গ্রামে ঘোরাফেরা করতে হয়, হঠাৎ হয়তো চিনতেও পারে। না হলেও একটা খবর দিয়ে রাখা ভাল।

থানার অল্পবয়সী অফিসার ভদ্রলোক মন দিয়ে সব শুনলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সীমাকে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারলেন না।

জিজ্ঞেস করলেন, নাম কি বলছে।

স্বদেশ বলল, যা বলছে তাতে সীমা বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আর কিছুই ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছে না।

আর একবার ওকে ভাল করে দেখে অফিসার ভদ্রলোক বললেন, কখনও দেখেছি বলে ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে পাশের গ্রামের

সেটেলমেণ্ট অফিসার ভদ্রলোকদের পুরো পরিবারটারই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের কিন্তু এ বয়সী একটি মেয়ে ছিল।

স্বদেশ একটু উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোকের আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিলেন না গ্রামে ?

—না। ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এসেছিলেন। কলকাতার অফিসে খোঁজ করে দেখতে পারেন।

সীমা এতক্ষণ মনযোগ সহকারে স্বদেশের রুমালটা ভাঁজ করছিল। কখন ওর অজান্তে পকেট থেকে বের করে নিয়েছে কে জানে। পছন্দ মত ভাঁজ হলে রুমালটা স্বদেশের গালে বুলিয়ে দিয়ে হেসে বলল, তোমাকে ছাজিয়ে দেই ?

ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে স্বদেশ অফিসার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি অবশ্য আরো খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সঠিক কোন খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা ওর কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না ?

সীমা আলসেমি ছেড়ে স্বদেশের কোলের উপর এলিয়ে পড়ল। তারপর আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলল, চল না, বালী দাবে না ?

অফিসার ভদ্রলোক সীমার দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে বললেন, আমার তো মনে হয় ওর নিজের আশ্রয় ও নিজেই বেছে নিয়েছে।

স্বদেশ সীমাকে তুলে দিতে দিতে বলল, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতো বুঝতেই পারছেন। চাল নেই, চুলো নেই, এক ছন্নছাড়া জীবন। এর ভেতর এসব বাচ্চাকাচ্চার দায়িত্ব নেওয়া মানে ওদেরই কষ্ট বাড়ান।

অফিসার ভদ্রলোকের সঙ্গে সীমার চোখাচোখি হল। একটু হেসে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, সীমা, তুমি আমাদের এখানে থাকবে ? ও চলে যাক, কি বল ?

ডাগর ডাগর দুটো চোখ মেলে কিছুক্ষণ ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকল সীমা। তারপর স্বদেশের একটা আঙুল মুঠো করে ধরে হঠাৎ জিভ বের করে ভেংচি কেটে দিল ভদ্রলোককে।

হো হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। স্বদেশও হেসে ফেলল।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা, আজ চলি তাহলে। আপনারাও একটু খোঁজখবর করে দেখুন। আমিও চেষ্টা করছি।

সারাটা পথ বেশ গল্প করতে করতে এল সীমা। ক্যাম্পে ফেরার পরও দেখা গেল সবার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কিছু সহজ হয়ে এসেছে। একমাত্র আনন্দ ছাড়া।

অবশ্য মাঝে মাঝে মার কাছে যাবার বায়না যে না ধরল তা নয়। কিন্তু অল্পায়াসেই ওকে ভুলিয়ে রাখা গেল। বোধহয় স্বদেশের উপর একটা আস্থা এসে যাওয়াতেই ওর সমস্ত ধাপ্পাই সরল বিশ্বাসে মেনে নিল সীমা।

কিন্তু বিপদে পড়ল স্বদেশ। সংসার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত স্বদেশ শিশুতীর্থ প্রসঙ্গে কোনদিনই সচেতন ছিল না। শত সমস্যা জর্জরিত পরাধীন দেশের বিশাল মানচিত্রে এই নবাগতা আগন্তুকদের অস্থিত্বই মাঝে মাঝে ওর অহেতুক বন্ধন বলে মনে হত। এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত তাই সব সময়। এমনকি সমস্যাটা যখন বিশাল মানচিত্র থেকে ডানা গুটিয়ে নিজেদের চালাঘরের তলে এসে আস্তানা গাড়ল তখন পর্যন্ত। অনুর অনুযোগ সত্ত্বেও। নানান গঞ্জনা শুনেও।

অথচ সেই সমস্যাই এক অবাঞ্ছিত রূপ নিয়ে এসে আচমকা আকড়ে ধরল ওকে। এই বন্যার অস্থায়ী আস্তানায়।

সমস্যাটা এক নতুন কৌতুক সৃষ্টি করল রাত্রে। খাওয়া দাওয়া হয়ে যেতেই বায়না ধরল সীমা, ঘুম দাও।

কথাটার অর্থোদ্ধারে বেশ কিছুটা সময় নিল স্বদেশ। বাইরে কিছুক্ষণ কোলে করে ঘুরে বেড়াল ওকে ঘুম পাড়ানর চেষ্টায়। কিন্তু বৃথা। সমানে হাত পা ছুঁড়ে চলল সীমা। অস্থির করে তুলল স্বদেশকে।

একটু চটে গিয়েই ওকে ধরে একটা ঝাঁকি দিল স্বদেশ, আরে বাবা, বলবিতো কি করতে হবে! কেবল ঐ এক বুলি, ঘুম দাও, ঘুম দাও। দেব ফেলে ঐ জঙ্গলে।

ক্যাম্পের ভেতর থেকে আনন্দ বেরিয়ে এল। সীমাকে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, স্বদেশদা খেয়ে এস, আমি রাখছি ওকে!

সীমা আনন্দকে দেখে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরল স্বদেশের, না দাব না, মালবে।

স্বদেশ চরম বিরক্তি নিয়ে বলল, কিযে যন্ত্রনায় পড়লাম আনন্দ, কি বলে ছাই বুঝিওনা। কেবল বলছে ঘুম দাও ঘুম দাও।

তপনও বেরিয়ে এসেছিল। বলল, আচ্ছা ঘুম পাড়িয়ে দিতে বলছে না-তো? বিছানায় শুইয়ে একটু থাবরে দেখুন না।

ভেতরে এনে ওর বিছানায় শুইয়ে দিল ওকে স্বদেশ। হঠাৎ কেঁদে উঠল সীমা, নত্‌তো হয়ে গেছে, নত্‌তো হয়ে গেছে।

নতুন সমস্যায় পড়লো আবার সবাই। সমবেত চেষ্টা শুরু হল শিশু অভিধান থেকে এ-কথার অর্থোদ্ধারে। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা গেল, বিছানার চাদরটা কুঁচকে গেছে, শ্রীমতীর সেটাই অভিযোগ।

এত দুঃখেও হেসে ফেলল স্বদেশ। বলল, পূর্ব্ববঙ্গে একটা প্রবাদ আছেনা, আলায় না বোলায় না মোর নাম সোহাগী, এ দেখছি তাই।

আনন্দ সবার অলক্ষ্যে দ্রুত একবার চোখ তুলে তাকাল স্বদেশের দিকে।

সীমা পাশ ফিরে শুয়ে ঝাকড়া চুলে ঢেকে যাওয়া চোখ ঘুরিয়ে বলল, গান?

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

দাশগুপ্ত হাসতে হাসতে বলল, সংসারই যখন পেতেছেন তখন আর ওটুকু বাকী রাখেন কেন স্বদেশবাবু; শুরু করুন গান।

স্বদেশ বিব্রত হল। বিরক্ত হল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল চোখমুখ। বলল, না, ওর নিজেই ঘুমোতে হবে। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে ওর সমস্ত বায়নাগুলো এখানে মানা হবেনা!

আনন্দ একটু হেসে বলল, বড়দের সঙ্গে ছোটদের এখানেই তফাৎ স্বদেশদা। ওরা কিছুতেই বুঝতে চায়না যে ওরা বানের জলে ভেসে আসা অবাঞ্ছিত আশ্রিত।

তপন প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিল সীমার দায়টা নিজের ঘাড়ে নেবার জন্য। এতদিন ওর একটা গর্বও ছিল যে বাচ্চারা নিমেষে ওর বশ হয়। সীমাই প্রথম ওর স্বরচিত স্বর্গে ফাটল ধরাল। অবশ্য এতেই পিছপা হবার ছেলে নয় তপন। সারাদিনের সঞ্চিত অবসরটুকু সমানে ও খরচ করেছে সীমার মনোরঞ্জনে। এ ক্ষেত্রেও তাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল ও।

আচ্ছা দেখছি আমি পারি কিনা। থপ করে সীমার পাশে বসে পড়ল তপন। হেসে বলল, কোন গানটা বলতো ভাই।

সীমা ভুরু কুঁচকে তাকাল তপনের দিকে। তারপর ঠোঁট বাঁকিয়ে স্বদেশকে দেখিয়ে বলল, তুমি না। ও।

গম্ভীর হয়ে উঠল স্বদেশ। চরম একটা বিরক্তি ফুটে উঠল চোখেমুখে। পদে পদে এতগুলো লোকের সামনে ওকে হাস্যাস্পদ করে তোলার জন্য কি কোমর বেঁধে লেগেছে মেয়েটা! ওর নিরাসক্ত গম্ভীর সত্তাটা নিয়ে যেন রীতিমত টানা হ্যাঁচরা শুরু করেছে ও।

একমাত্র আনন্দই টের পেল সেটা। মনে মনে খুসী হল। স্বদেশদার গম্ভীর নিরাসক্তির মুখোসটা সীমার কচি হাতের টানে যদি নেমে আসে, আসুক না। সীমার ছোট্ট হাতে আর একটা অস্ত্র তুলে দেবার জন্যই যেন আনন্দ কপট বিরক্তিতে ফেটে পড়ল, বাবারে বাবা, এ মেয়ের বায়নাক্কারও শেষ নেই! ঠিক আছে চলুন, আমরা অবাঞ্ছিতেরা বিদায় নিয়ে দেখি একটু ঘুমিয়ে শান্তি দেয় কিনা!

আনন্দের প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিল সবাই। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফাঁকা ক্যাম্পে থাকল শুধু অপদস্থ স্বদেশ আর অপ্রস্তুত সীমা। একদৃষ্টে সীমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্বদেশ। সে দৃষ্টিতে বিরক্তি। সঙ্কোচ। ক্ষোভ। সীমার চোখে একটা ভীরু অপরাধ বোধ। অসহায় আর্তি। আশ্রয়ের আকুলতা। ওর সে ভীরু অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই কেমন যেন একটা রূপান্তর ঘটল স্বদেশের দৃষ্টিতে। বিরক্তি, সঙ্কোচ ও ক্ষোভের ছোট ছোট ঢেউগুলো ভেঙ্গেচুরে মিলে মিশে একটা প্রশান্ত সহানুভূতির ছায়া ফেলল সেখানে। আস্তে এগিয়ে গেল ও সীমার দিকে।

সীমার ঠোঁটদুটো ফুলে ফুলে উঠল। ভীরু অসহায় কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠল, আল কব্‌বোনা, আল কব্‌বোনা আমি।

আনন্দ বাইরে চুপ করে বসে এই নতুন সমস্যাটা নিয়েই ভাবছিল। সমস্যাটাকে বিভিন্ন দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। বারে বারে মনে হচ্ছিল স্বদেশদার দাম্পত্য-জীবনের নিস্তরঙ্গ গুমোট সমুদ্রে ছোট্ট এই আপনা থেকে আসা এ্যালবাট্রসটা কি মুক্তির হাওয়া তুলতে পারেনা?

ঢেউ তুলে তুলে সমুদ্র যাত্রার বাকী পথটা সুগম সহজ করে তুলতে পারে না?

ক্যাম্পের ভেতর থেকে আলতো কুয়াশার মত একটা আবছা সুর ভেসে এল। ঘুম পাড়ানী সুর। কৌতুকে সোজা হয়ে বসল আনন্দ। ফিরে তাকাল ভেতরের দিকে। অসহায় নিরাশ সমুদ্র যাত্রায় একটুকরো গাছের ডাল দেখতে পাওয়া কলম্বসের মত এক অজানা আশায় চিকচিক করে উঠল ওর চোখ দুটো।

আর, উৎসাহের প্রাবল্যে সেদিনই, অনেকদিন পর, আবার আনন্দ স্বদেশের সামনে এসে দাঁড়াল একটা পুরোন দাবী নিয়ে।

খাওয়া দাওয়ার পর স্বদেশকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল। বলল, চল স্বদেশদা একটু বেরিয়ে আসি। বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

মেটে মেটে জ্যোৎস্নায় গোটা গ্রামটাকে কেমন যেন বিষন্ন মনে হচ্ছিল। চারদিকে চিক চিক করছিল জল। স্বদেশ নতুন সমস্যাটাই ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। আনন্দ মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল স্বদেশকে। তারপর এক সময় স্বদেশের দিকে ফিরে বলল, ভারী লাভ্‌লি মেয়েটা, না?

স্বদেশ ফিরে তাকাল আনন্দের দিকে। আনন্দর উচ্ছ্বাসের ভেতর কি যেন খুঁজল। তারপর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, একটা নতুন উপদ্রব।

আনন্দ বুঝল, ও ধরা পড়ে গেছে। বাঁকা পথে আর গেলনা তাই। হঠাৎ সরাসরি ওকে প্রশ্ন করে বসল, তুমি আবার রাজনীতি শুরু করতে পারনা স্বদেশদা?

এই আচমকা প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেল স্বদেশ। তারপর জিজ্ঞেস করল, কেন?

—তোমার সেই আগের উদ্দাম কর্মঠ ঋজু চেহারাটা কিছুতেই ভুলতে পারিনা। তোমার সেটাই আসল রূপ স্বদেশদা।

স্বদেশ এ কথার কোন উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে মোলায়েম গলায় বলল, নতুন কি একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখেছ বলছিলে সকালে।

ক্ষুণ্ণস্বরে বলল আনন্দ, আমাকেও 'ফাঁকি দেবার চেষ্টা করনা স্বদেশদা, নিজেকে ফাঁকি দিতে দিতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ টের পাও?

স্বদেশ সামান্য আহত হল। কিন্তু সেটা সামলে একটু হেসে সহজ সুরে

বলল, ফাঁকি কোথায় দেখলে? বিশ্বস্ত সৈনিকের মত যুদ্ধ জয় করে দিয়েছি, এখনতো আমাদের বিশ্রামের পালা।

প্রতিবাদ জানাল আনন্দ।—আর একটা আত্মপ্রতারণা। বরং বল, সেই জয় নিয়ে কিছু লুব্ধ হাতের ছিনিমিনি খেলা দেখে ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছ।

এবারও সহজ সুরে বলল স্বদেশ, তাহলে তাই।

আনন্দ উত্তরটা শুনে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, তাহলে তাই! কিন্তু একদিন যারা তোমাদের ডাকে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল, আজ যদি তারা তোমাদের পলাতক, প্রতারক বলে অনুযোগ করে, অস্বীকার করতে পারবে?

স্বদেশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, হয়তো পলাতক, আমি অস্বীকার করিনা আনন্দ। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তাকে মার্জিত রাখার জন্য অনেক বেশী শক্তির প্রয়োজন। ঘরের বাইরের অনেকগুলো আঘাতে সেই শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই নিঃশব্দে সরে এসেছি। কিন্তু অন্য কাউকে আমি প্রতারণা করিনি আনন্দ।

কথাটা এভাবে যে গ্রহন করবে স্বদেশ ঠিক বোঝেনি আনন্দ। লজ্জিত হল, সামান্য অভিমানের সুরে বলল আনন্দ, কিন্তু তোমাদের উপর আমাদের দাবী অনেক বড়।

স্বদেশ টেনেটেনে জবাব দিল, কিন্তু আমরাও তো মানুষ আনন্দ। আমাদেরও শক্তি সামর্থ ধৈর্য্যের একটা প্রশ্ন আছে। আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, থাকগে, এ দীর্ঘ বিতর্কের বিষয়। যার কোন শেষ উত্তর নেই। বরং একটা গান গাও শুনি।

আনন্দ এর কোন জবাব দিলনা, আস্তে মাথা নীচু করল।

কয়েকদিনের ভেতরই আরো দু-চারটা বেসরকারী সেবাব্রতী দল চলে এল। কিছুটা উদ্বেগ কাটল স্বদেশের। একটু হাফ ছাড়বার সুযোগ পেল।

এ-কদিনে সীমাও কিছুটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে। সবার সঙ্গে, অন্তরঙ্গতা না হলেও, অসহযোগের মনোভাবটা কেটেছে। হরলিক্স আর বিস্কুটের উপঢৌকনে আনন্দও সন্ধি স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। বিজয়ীর মালা পেয়েছে তপনও। সীমার আদেশ পেলেই তপন অবলীলাক্রমে ওর মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে কখনও ঘোড়া, কখনও হাতি, কখনও বা নৌকা হয়ে ভেসে বেড়ায় ক্যাম্পের মেঝেতে। বাইরের চত্বরেও। অবশ্য সেয়ানা মেয়ে সীমা। প্রয়োজন বোধে সবাইকেই কিছুটা প্রশ্রয় দিলেও সচেতন একটা সীমারেখা মেনে চলে আর সবার সঙ্গে। একমাত্র ব্যতিক্রম স্বদেশ। স্বদেশের সীমাহীন অধিকার। স্বদেশ না চাইলেও, সে অধিকার জোর করেই ওর উপর চাপিয়ে দেবে সীমা।

আনন্দের পাশে বসে বাইরে তপনের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান সীমার দিকে তাকিয়ে ওর কথাই ভাবছিল স্বদেশ।

আনন্দ একমনে ওষুধ তৈরী করছিল। সীমার হাসি শুনে ফিরে তাকিয়ে হেসে বলল, তপনের সঙ্গে খুব খাতির হয়ে গেছে, না ?

স্বদেশ কোন উত্তর দিলনা। ·কিছুক্ষণ বাদে চিন্তান্বিত ভাবে বলল, চেষ্টা করেও সে রকম কোন খোঁজ খবর তো পাওয়া গেল না। ভাবছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনের ওঁদের হাতে তুলে দিলে কেমন হয়।

আনন্দ ওষুধ তৈরী করতে করতেই বলল, তার আগে সেই সেটেল-মেণ্ট অফিসারের কলকাতার অফিসে একবার খোঁজ করে দেখবে না ?

স্বদেশ বলল, কোন লাভ আছে বলেতো মনে হয় না। ওঁর ঐ বয়সী একটি মেয়ে ছিল, এর বেশী কোন হদিসতো কেউ দিতে পারছে না।

আনন্দ ফিরে তাকাল।—তবু একবার অফিসে খোঁজ করে ওঁর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করে দেখা বোধহয়···

স্বদেশ সোজা ওর চোখের দিকে তাকাল।—যদি না পাওয়া যায় ?

এই সরাসরি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু বিব্রত বোধ করল আনন্দ। তারপর কি যেন চিন্তা করে গভীর দৃষ্টিতে স্বদেশের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্বদেশদা ?

—বল।

—যে কটা দিন ব্যবস্থা না হয় তোমার কাছেই যদি থাকে ?

স্বদেশ আপত্তি জানাল।—সে কি করে হয় ?

আনন্দ জোর দিয়েই বলল, কেন, তোমাদের মাত্র দুজনের সংসার। বাইরের কোন ঝামেলা নেই। অসুবিধের কি আছে ?

স্বদেশ একটু আমতা আমতা করল।—তা হয় না আনন্দ। তোমাকে ঠিক সব বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু—

গভীর স্বরে বলল আনন্দ, আমি সব বুঝেই বলছি স্বদেশদা। বৌদির কথা ভেবেই বলছি। ওষুধতো অনেক খাওয়ালাম। এবার একটু অন্য-ভাবে চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি ?

স্বদেশ চিন্তিত হল। তারপর বলল, যদি বিপরীত ফল হয় ?

আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আশ্রমতো খোলা আছেই।

অবশ্য এত সহজে সমাধানের পথটা মেনে নিতে পারল না স্বদেশ। কিন্তু অনুর কথা চিন্তা করে সরাসরি নাকচ করেও দিতে পারল না। সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

বহুদিন পর নতুন এই সমস্যাটা ভাবিয়ে তুলল স্বদেশকে। জীবনের আগের সমস্যাগুলোকে নিয়ে ঘর করতে করতে অনেকটা সহজ ও সহনীয় হয়ে এসেছিল। নতুন এ সমস্যাটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলনা ও।

আনন্দ বলল, অফিস থেকে তো নতুন আর একটা পার্টি আসছেই, বাইরের পার্টিও এসে গেছে দু-চারটা। তাছাড়া অবস্থাও এখন অনেকটা ভাল। অফিসের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করে তুমি বরং কলকাতায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা কর।—একটু হেসে বলল, দরকার হলে আমি বরং সিক্-রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছি।

হঠাৎ একটুকরো দমকা হাওয়ার মত নাচতে নাচতে সীমা এসে হাত পেতে দাঁড়াল আনন্দর সামনে।

—আমাল হল্‌লিক্‌ছ ?

আনন্দ হেসে বলল, হরলিক্স ? তৈরীই আছে, চলে এস !

স্বদেশ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল এই হঠাৎ আসা ঝ'ড়ো বাতাসটাকে।

এই নির্জন দুপুর ভাল লাগেনা অনুর। এই নিরালা আকাশ বড় বেশী একা মনে হয়। বড় নিঃসঙ্গ। সকাল সন্ধ্যা নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য তবু একটা সংসার আছে। ছোট হলেও একটা আস্তানা। রাত্রির জন্যেও একটা সঙ্গ আছে। ঘনিষ্ঠ না হলেও একটি দ্বিতীয় অস্তিত্ব। কিন্তু দুপুরগুলো ওর একক অস্তিত্বকে বড় বেশী পীড়ন করে। সীমাহীন আকাশের বুকে বিন্দু বিন্দু চিলের মত নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হয়। চারদিকে শুধু ধুধু আকাশ আর আকাশ। মেঘের ছায়া নেই। মাটির আশ্রয় নেই।

পুষিটার তিনটে বাচ্চা হয়েছে। স্বদেশ দেখে যায়নি। ভীষণ ব্যস্ত এখন পুষিটা। রোজ অনুর পাশে এসে গুটিসুটি মেরে শোয়। গলায় বিলি কাটলে ঘরঘর করে আরামের স্বীকৃতি জানায়। কিন্তু এখন ও ব্যস্ত বাচ্চাগুলো নিয়ে। ঘরের কোণে ঝুড়ি পেতে দেওয়া আতুরঘরে শুয়ে দুধ দিচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। আরামে চোখ বুজে আছে।

সারা দুপুর অনু চোখ বুজতে পারে না। অথচ সারা দুপুর ওকে ব্যস্ত রাখার কেউ নেই। বিরক্ত করার কেউ নেই। ওকে জড়িয়ে জাপটিয়ে মিষ্টি যন্ত্রণা দেবার মত ছোট ছোট কোন অস্তিত্ব নেই ওর আশেপাশে। ছিল, কিন্তু এখন নেই। থেকে নেই বলেই বোধহয় এ যন্ত্রণা। কোনদিন না থাকলে এত যন্ত্রণা থাকত না। ক্ষোভ থাকত হয়তো কিন্তু এ দাহ থাকত না। এ দারুন দাহের চৈত্রদিন তো ওর জীবনেও শেষ হতে পারত! এখনও পারে। কিন্তু হচ্ছেনা। বর্ষার সময় যাচ্ছে কিন্তু আভাস নেই, এ বড় যন্ত্রণাদায়ক উৎকণ্ঠা।

পুষুটা সারাদিন চোখেচোখে রাখে বাচ্চাগুলোকে। অনুরও চোখ রাখতে হয়। একটা হুলো বিড়াল মাঝেমাঝে ঘুরঘুর করে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলবে হয়তো। অথবা আহত করে যাবে। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে অনুর। নিজের বাচ্চা নিজের খেতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না ওরা। বাৎসল্যটা তাহলে সহজাত নয়! তাহলে পুষুকে বাৎসল্য কে শেখাল! ওকে তো কেউ শেখায় নি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন যেন দৃঢ় হয়ে উঠল অনুর চোখমুখ। কি

এক গভীরতর চিন্তায় ঋজু হয়ে উঠল দৃষ্টি। বিরাট একটা ক্ষোভ। ক্রোধ। অনুতাপ। আর যন্ত্রণা।

এ দুপুরগুলো এত বড় কেন? কলে জল আসবে কখন? কলে জল এলেই তো সংসারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কে এল? নিজেকে ঠিক করে নিয়ে দরজা খুলে দিল অনু।

বড়দি। ওর বড় ননদ।

ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, কি, কেমন আছ সব?

অনু বলল, ভালই।

স্থূলকায়া মধ্যবয়সী বড়দি খাটের উপর হাত পা ছড়িয়ে বসে হাঁপ ছাড়লেন, বাবা, এই তিনতলার সিঁড়ি ভাঙবার ভয়েই তোমাদের এখানে আসিনা।

অনু একটু হাসল। পাখা নিয়ে এসে পাশে বসল। জানে অনু, এই একজন মাত্র ওরা দশ তলায় বাসা করলেও আসবেন। ওদের খোঁজ খবর নেবেন। তারপর ওরা ভাল আছে শুনেও মনেমনে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে যাবেন। কারণ, ওদের নিছক শারীরিক সুস্থতার চেয়েও আরো বড় একটি কুশল সংবাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উনি আসেন। এবং সে সংবাদ নিজের অনুভূতি দিয়েই উনি আহরণ করে নিয়ে যান।

সংসার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত দেশকর্ম্মী ভাইকে এই দিদিই প্রায় জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। মা চিররুগ্না ছিলেন, উনিই মানুষ করেছিলেন স্বদেশকে। তাই ওঁর উৎকণ্ঠায়ই বেশী। অনুতাপও স্বাভাবিক।

—সন্তু নেই বলে কোন অসুবিধে-টিধে হচ্ছে না তো?

মৃদু মাথা নাড়ে অনু, না।

—এ-কদিন নন্তুও তো এসে শুতে পারত, তুমি না করলে কেন?

অনু বলল, আবার কষ্ট করে আসার কি দরকার? আশেপাশের সব ঘরেই লোক আছে। প্রায় এক বাড়ীর মতই তো।

—সন্তুর চিঠি পেয়েছ তো? ফিরছে কবে?

অনু চুপ করে থাকল। বুঝলেন দিদি, স্বদেশ কোন চিঠি দেয়নি।

একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, কিযে ওর ধরন-ধারণ বুঝিনা। একটা পৌছ সংবাদ দিতে কি-এমন সময়ের দরকার ?

অনু চোখ না তুলেই বলল, হয়তো দু-চার দিনের ভেতরই চলে আসবেন, তাই।

দিদি আর কিছুই বললেন না। বলার নেই বলে। এসব সময়ে সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা রাগ হয় ওঁর অনুর উপর। কেন অনু আর একটু জোর করতে পারে না। কেন ও নির্লিপ্তভাবে ওর সমস্ত দাবী তুলে নিয়ে বসে থাকে। নিজের অধিকার সম্বন্ধে আর একটু দৃঢ় হতে পারেনা ও !

অনু প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করে।—আপনাদের পুরী যাবার সব ঠিক হয়ে গেল ?

দিদি বললেন, হ্যাঁ, বাড়ী ভাড়ার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এর ভেতর সতু ফিরে এলে, তুমিও চলনা আমাদের সঙ্গে দিন কয় ঘুরে আসবে।

একটু ম্লান হাসল অনু, আমার সুবিধে হবেনা বোধ হয়।

উত্তরটা জানতেন দিদি। এবং এও জানতেন যে অনুরোধে কোন ফল হবেনা। তবু বললেন, কেন, তোমার ঠ্যাকাটা কি, শুনি ? কারো সঙ্গে মিশবে না কোথায় যাবেনা—এভাবে কেউ বাঁচতে পারে ?

অনু উত্তর দিল না। পাখা রেখে উঠে দাঁড়াল, দাঁড়ান, চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি।

আলমারী থেকে হিটারটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল অনু।

এরপর দিদি চা খাবেন। হেসে হেসে প্রায় মেয়ের বয়সী অনুর সঙ্গে রাজ্যের গল্প করবেন। অনু শ্রদ্ধা নিয়ে শুনবে। হাসবে। নিজেও দু-চারটা কথা বলবে হয়তো। তারপর দিদি হাসিমুখে বিদায় নেবেন।

আর নামতে নামতে রোজকার মতই চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন দিদি। কারণ, ওদের নিছক শারীরিক সুস্থতার চেয়েও আরো বড় একটা কুশল সংবাদের আকাঙ্খা নিয়ে উনি আসেন। এবং সে সংবাদ নিজের অনুভূতি দিয়েই উনি আহরণ করে নিয়ে যান।

অনুর এ বিষন্ন গাম্ভীর্য্যের সামনে সকলেই অস্বস্তি বোধ করে। কখনও

এ গাম্ভীর্য্যকে দুর্বোধ্য মনে হয় ; কখনও দুর্ভেদ্য। আর সবার থেকে একটা সহজ দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে তাই ওর। কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম তাপ্তী। বড়দির মেয়ে তাপ্তী। যার ঝ'ড়ো হাওয়ায় মাঝে মাঝে ওর গাম্ভীর্য্যের শেকড়ে টান পড়ে।

তাপ্তীর চরিত্রে গাম্ভীর্য্যের কোন বালাই নেই। অথচ গভীরতা আছে। বিষাদের কোন দায় নেই। কিন্তু সমবেদনার মন আছে। মাঝে মাঝে ওকে দেখে হিংসে হয় অনুর। কি করে এ যুগে, প্রায় অসচ্ছল সংসারে পা রেখে, এমন পালক-মন নিয়ে দিন কাটায় ও। অথচ শুধু হালকা হাওয়ায় দায়িত্বহীন জীবন কাটায় না। সারাদিনে গোটা তিনচার টিউশানি করে। সংসারের প্রয়োজনেও হাত লাগায়। আর, একই সঙ্গে চরকির মত ঘুরে বেড়ায় রাজনৈতিক কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নিয়ে। যে রাজনীতির উপর বিতৃষ্ণার অন্ত নেই অনুর। যে রাজনীতিকে ও মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।

বড়দি চলে যাবার পর মনটা আবার ভারী হয়ে উঠেছিল অনুর। সন্ধ্যাপূজা সেরে রান্না ঘরে বসে চা খেতে খেতে বড়দির কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল। পায়ের সামনে বসে বিড়ালদুটো কাপ থেকে দুধ খাচ্ছিল। হঠাৎ তাপ্তীর সশব্দ আবির্ভাব। ওর আগমন মানেই বিজ্ঞাপন।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও মামী, পুষ্যিগুলোকে সবটুকু দুধ খাইয়ে ফেল না। ভীষণ চা তেষ্টা পেয়েছে।

নিজেই পিঁড়ি পেতে জাঁকিয়ে বসে তাপ্তী। অনু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন রাজ্য জয় করে ফিরলে?

তাপ্তী আঁচল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলল, মামা আসেনি অফিস থেকে?

কেটলিতে গরম জল ঢালতে ঢালতে বলল অনু, এখানে নেই।

—কোথায় গেছে?

কিছুটা টেনে টেনে জবাব দিল অনু, বন্যাত্রানে।

তাপ্তী অনুর চোখের দিকে তাকিয়ে সহজ সুরেই বলল, ও হ্যাঁ, শুনেছিলাম তো। আমরাও তো বন্যার ইস্যুতে মিটিং করে এলাম।

একটু হাসল অনু, সরকারকে তুলোধুনে এলে, না?

দুষ্টু হাসির সম্মতি জানাল তাপ্তী। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, অবশ্য অহেতুক নয়, হেতুগুলো সব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে।

অনু হাত বাড়িয়ে কাপ নিতে নিতে বলল, জলেডোবা হতভাগা-গুলোকে নিয়েও তোমাদের রাজনীতি ?

তাপ্তী অনুর দিকে তাকাল, ঐ হতভাগাগুলোর জন্যই তো রাজনীতি মামী।

অনুও একটু গম্ভীর হল, মিথ্যে কথা। রাজনীতি তোমাদের নিজেদের নাম, যশ আর আত্মতৃপ্তির জন্য।

তাপ্তী হেসে ফেলল।—যাক, তবু এখানে এসে থেমেছ। অনেকে তো চটেমটে আরো এগিয়ে যায়, বলে, পাত্র পাকড়ানর জন্যই নাকি মেয়েদের রাজনীতি।

অনু ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তাপ্তীর দিকে, তারপর একটু হেসে বলল, সব জেনেশুনেও তোমার সম্বন্ধে আর সেটা বলি কি করে ?

তাপ্তীর চোখেমুখে একটা মিষ্টি লজ্জার ছাপ পড়ল। হাত বাড়িয়ে চা নিতে নিতে বলল, থাক, খুব হয়েছে ! মামা ফিরছে কবে ?

অনু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। সেই বিষন্ন গাম্ভীর্য্য। বলল, বিয়ের পর রাজনীতিটা ছেড়ে দিও তাপ্তী। মেয়েদের জন্য ওসব নয়।

তাপ্তী অনুর পরিবর্ত্তন টের পেয়েছিল। সেটা উড়িয়ে দেবার জন্যই প্রয়োজনের বেশী তারল্যে হো হো করে হেসে উঠল ও।—এই দেখ ! কেন দুটোর কি ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ নাকি ?

অনু একই স্বরে বলল, তা নয়, তবু দুটোর একটা বেছে নেওয়াই ভাল। না হলে দুটোই হয়তো হারাতে হয়। জীবনটাও তছনছ হয়ে যায়, রাজনীতিও হয় না।

এতক্ষণের হালকা মনটা তাপ্তীর ভারী হয়ে উঠল। ও জানে, হাতের মুঠে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়েই অনু ওর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে। তাপ্তী বয়সে ওদের অনেক ছোট। তাছাড়া এ প্রসঙ্গটা ওর সামনে প্রকাশ্যে মামা ও মামী কোনদিন নিজেরা তুলে না ধরায়, অনেক কিছুই জানা সত্ত্বেও, তাপ্তীর নিজেকে অপ্রকাশ রাখতে হয়।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্য সশব্দে চায়ে চুমুক দিয়ে সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল, রাত্রে কে থাকে মামী ?

—কেন, একাই তো থেকে এলাম চিরদিন।

একটু বিস্মিত হল তাপ্তী।—সেকি, আমিতো ভেবেছিলাম ঝি-টি কেউ শোয় বলেই অস্ত-নস্তদের আসতে মানা করেছ। খুব অন্যায় করেছ কিন্তু। ঠিক আছে, এখন উঠছি, কিন্তু আজ থেকে রাত্রে আমিই এসে শোব।

অনু একটু জোর দিয়েই বলল, কোন দরকার নেই। দেশ নেতাদের বউদের অত ভয় থাকলে চলে না।

তাপ্তী যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর অনুর চোখে চোখ রেখে গভীর স্বরে বলল, তোমার সব কথা হয়তো বুঝি না মামী, কিন্তু মেয়ে বলেই কিছু বুঝি। আমি বাড়ীতে বলে আসছি।

বলেই ঘুরে দাঁড়াল তাপ্তী। বটুয়াটা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পেছন থেকে ডাকল অনু, কোন দরকার নেই তাপ্তী ; এই, শোন—

কিন্তু ততক্ষণে সিঁড়ির মুখে পৌছে গেছে তাপ্তী। সেখান থেকেই চীৎকার করে নামতে নামতে বলল, সেটা আমি বুঝব। দেরী দেখলে আবার ঘুমিয়ে পড় না যেন।

সিঁড়ির দিকে গভীর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকল অনু। স্বদেশের কাছ থেকে, দিদির কাছ থেকে যে জয় ও নিজের দৃঢ়তায় অর্জন করেছিল, মেয়েটা এক পলকের দমকা হাওয়ায় যেন উড়িয়ে দিয়ে গেল সেটা।

দিন সাতেক পর কলকাতায় ফিরে এল স্বদেশ। অনেক চিন্তার পর সীমাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরল। আনন্দর উপর্য্যুপরি অনুরোধের পর ওর কথাই মেনে নিল স্বদেশ। সত্যিইতো, নতুনভাবে একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?

বাড়ীতে ঢোকার আগে মনে মনে আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করে

নিল স্বদেশ। সীমার দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে এল।

দরজার কাছে এসে ভেতরে একবার উঁকি মেরে দেখল। আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে একরাশ সাজান পুতুল ও খেলনা নতুন করে সাজাচ্ছে অনু।

একটু নিচু হয়ে সীমার গাল টিপে আদর করল স্বদেশ। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, সব মনে আছে ?

মাথা নেড়ে বলল সীমা, হুঁউ-উ।

—কি বলে ডাকবে ওকে ?

কৌতুকে চোখ ঘুরিয়ে বলল সীমা, মামণি !

—বাঃ, গুড্ গার্ল! আচ্ছা দেখিত এবার কেমন ভাব করতে পার মামণির সঙ্গে। পারবে ?

মাথা নাড়িয়ে বলল সীমা, হুঁ-উ-উ।

স্বদেশ সামনে ঠেলে দিল ওকে, যাওতো !

সীমা পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। চোখে মুখে মিষ্টি একটা দুষ্টুমির ছাপ। চৌকাঠের সামনে গিয়ে আস্তে ডাকল, মামণি !

অনু চমকে ফিরে তাকাল। অবাক হয়ে গেল সীমাকে দেখে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কি বললে ?

সীমা একটু ঘাবড়ে গেল। গম্ভীর হয়ে বলল, মামণি।

—মামণি ! —অবাক হয়ে কাছে এল অনু। —কার সঙ্গে এসেছ তুমি ?

পেছন ফিরে আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে দেখিয়ে দিল সীমা, ওর সঙ্গে।

বাইরের দিকে ফিরে তাকাল অনু। ছোট্ট একটা অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে এগিয়ে এল স্বদেশ। ভেতরে ঢুকল। সুটকেসটা নিয়ে এগিয়ে গেল ঘরের কোণের দিকে।

অনু স্বদেশের দিকে ফিরে তাকাল। —তোমার সঙ্গে এসেছে ? কার মেয়ে ?

সুটকেসটা রেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল স্বদেশ, ভারী সুন্দর, না ? দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে না ?

অনু আবার জিজ্ঞেস করল, অন্য কোন ফ্ল্যাটের নাকি ?

স্বদেশ একটু ইতস্তত করে বলল, না, ঐ রিলিফে গিয়েছিলাম, সেখানেই এসে ঘাড়ে চাপল। বন্যায় ওর মা-বাবা সব ভেসে গিয়েছে। কাল ওর বাবার অফিসে খোঁজ করে আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে আর কি।

এবার একটু গম্ভীর হল অনু। —খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত কি এখানেই থাকবে ?

—ভাবছি।

—যদি খোঁজ না পাওয়া যায় ?

—তাহলে অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কাদের মেয়ে টেয়ে কিছু পরিচয় না পেয়ে—

জোর করে একটু হাসল স্বদেশ, পরিচয় আবার কি ? শিশুদের সবচেয়ে বড় পরিচয়—ওরা শিশু। যেমন মায়েদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তারা মা।

হঠাৎ অনুর দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্বদেশের দিকে। তারপর অনুচ্চস্বরে টেনে টেনে জিজ্ঞেস করল, সত্যি কথা বল ত, এক বন্যায় সব হারিয়েছিলাম বলে আর এক বন্যা থেকে আমাকে ভুলানর জন্য খেলনা নিয়ে এসেছ কিনা।

স্বদেশও এবার কিছুটা গম্ভীর হল।—না, ফুলের মত মেয়েটা যাতে নোংরা হাতের খেলনা হয়ে না ওঠে, সেজন্যই এনেছিলাম।

অনু এবার ভুরু কুঁচকে বিরক্তি নিয়ে বলল, কিন্তু শিশুদেরও জাত-কুলের একটা প্রশ্ন আছে। সেটা কি···

স্বদেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, অকূলে ভেসে যাচ্ছিল, কূল দেওয়াটা তাই মানুষ হিসেবে আমার কর্ত্তব্য বলে ভেবেছিলাম। আর জীবনে এমন অনেক দায়িত্ব অনেক সময় আমাদের পালন করতে হয় যা সবসময় খুব আরামদায়ক নয়।

স্বদেশের এভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় বিরক্ত হল অনু। বলল, জীবন ভরই তোমার বক্তৃতা শুনলাম। কিন্তু তোমারও জানা উচিত যে শ্রোতারা ইট কাঠ নয়, তাদেরও ধৈর্য্য বলে একটা জিনিষ আছে। মন বলে একটা পদার্থ আছে।

আচমকা সীমার দিকে ফিরে তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করল অনু, এই, তোর নাম কি ?

আলোচনার পূর্ণ মর্মার্থ বোঝার কথা নয় সীমার। কিন্তু ওর শিশু অনুভূতিতে বোধহয় বুঝতে পারছিল ও, আলোচনাটা খুব হৃদ্যতাপূর্ণ নয়। একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল তাই। গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন শুনে চোখ তুলে বলল ও, ছিমা।

—সীমা কি ?

—আছিমা।

—নাসিমা !—বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল অনু।

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল স্বদেশ, না, অসীমা।

স্বদেশের দিকে ফিরে তাকাল অনু, কি করে বুঝলে ?

—কেন, স্পষ্টই তো বলছে।

অনু শ্লেষের সঙ্গে বলল, নিজের স্বার্থে অস্পষ্ট জিনিষগুলোকে স্পষ্ট করে নেবার চেষ্টা করছ কেন ?

স্বদেশও নিজেকে শক্ত করল। বলল, স্পষ্ট জিনিষগুলোকে অস্পষ্ট করে তুলে মানসিক অশান্তি বাড়িয়ে লাভ নেই বলে।—সীমার দিকে তাকিয়ে ডাকল ও, সীমা, এদিকে এস।

সীমা সরে এসে স্বদেশের হাঁটুর সঙ্গে মিশে দাঁড়াল। আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল অনুকে। সীমাকে নিয়ে নিজের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াল স্বদেশ।

তীক্ষ্ণস্বরে ডাকল অনু, শোন।

ঘুরে দাঁড়াল স্বদেশ। অনু একটু এগিয়ে এসে বলল, নাসিমা যদি নাও হয়, তবু তুমি ওর কোন পরিচয় জাননা,—নয় কি ? যদি মুচি, মেথর চাড়ালের মেয়ে হয় ?

শান্ত স্বরে বলল স্বদেশ, অহেতুক একটা সন্দেহ দাঁড় করিয়ে নিজের অশান্তি কেন বাড়াচ্ছ অনু। আর তাও যদি হয়, তবু ওকে এনেছি বলে বর্ত্তমানে ওর সব দায়িত্ব আমার।

এবার ফেটে পড়ল অনু।—দায়িত্ব দায়িত্ব দায়িত্ব! খুকুকে বাঁচানর দায়িত্ব তোমার ছিল না ? তখন কোথায় গিয়েছিল তোমার কর্ত্তব্যবোধ ?

অনুযোগের সুরে চাপা ধমক দিল স্বদেশ, ছিঃ অনু; তোমরা না মায়ের জাত!

এবার হঠাৎ আবেগে তুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল অনু, হ্যাঁ, তাই তোমাদের মত নিষ্ঠুর নই। খুকুর স্মৃতি ভুলে তাই তোমাদের মত নতুন খেলনা নিয়ে মাততে পারি না।

হতভম্ব সীমাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্বদেশ। অনুকে এখন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। বরং কাঁদুক ও। কান্না হয়ে কিছু যন্ত্রণার স্মৃতি মন থেকে ঝরে পড়ুক।

তারপর নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেল। সমস্যাটা এত তীব্র আকার ধারণ করবে ঠিক বুঝতে পারেনি ও। এ প্রসঙ্গটা অনেকদিন এড়িয়ে চলতে পেরেছিল ওরা। ফেলে আসা পুরোন জীবন থেকে এই নতুন জীবনে আসার পথে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সমস্যা পেরিয়ে আসতে হয়েছিল বলেই হয় তো অনন্যমনা অনু কিছুটা অন্যমনা হয়েছিল। দাম্পত্য জীবনের পুরোন ফাটলটা অবশ্য জোড়া লাগেনি কিন্তু রোগের অনেকগুলো উপসর্গ অনুপস্থিত আছে অনেকদিন। এমন কি অনুকে ভাগ্নী উমার বাচ্চাটাকে লুকিয়ে আদর করতেও দেখেছিল একদিন। এসব নানান কারণেই সাহস পেয়েছিল স্বদেশ মেয়েটাকে আনতে। ওর জাতিগত প্রশ্নটা অবশ্য অতটা খতিয়ে দেখেনি আগে। প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করছিল বলেই হয়তো।

সীমা চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল স্বদেশকে। একবার আস্তে ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল, মামণি তোমাকে বকেছে?

স্বদেশ কোন উত্তর দিল না। আরো কাছে সরে এসে স্বদেশের দিকে মুখ তুলে বলল সীমা, মামণি আমাকে আদল কলে নিতো?

স্বদেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে ওকে ঠেলে দিয়ে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল, ওখানে চুপচাপ বস গিয়ে, গোলমাল করোনা।

তাপ্তী ওদের আলোচনার মাঝখানেই এসে পড়েছিল হঠাৎ, ওরা টের পায়নি। তাপ্তীও ওদের একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে সঙ্কোচ বোধ করছিল। তাই দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার

এসে সীমাকে কোলে তুলে নিল। স্বদেশের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, বোধহয় ভুলই করলে মামা।

স্বদেশ উঠে দাঁড়িয়ে তাপ্তীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, জীবনভর সবাই শুধু আমার ভুলই দেখে গেল তাপ্তী, এটাই আমার দুঃখ।

মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্বদেশ।

রাত্রে খাবার পর বারান্দায় রেলিংয়ের পাশে ইজিচেয়ারটা পেতে বসেছিল স্বদেশ। সীমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছিল। কিছুটা অপ্রস্তুত ও ভীত সীমা কোন আপত্তি করেনি।

অনু খেয়ে এসে সীমার ঘরে গেল সুপারি খেতে। পানের বাটা ও ঘরেই থাকে। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল, সীমা চোখ বুজে শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

খাটের পাশে গিয়ে বসল অনু। খাটের নীচে ঝুঁকে পড়ে পানের বাটা বের করল।

হঠাৎ ভীতস্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলল সীমা, মামণি, ভয় করে।

চমকে চোখ তুলে তাকাল অনু। সীমার চোখের দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য মনে হল এ দৃষ্টিটা বড় পরিচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। আস্তে উঠে গিয়ে বারান্দায় স্বদেশের সামনে দাঁড়াল।

—ডাকছে।

স্বদেশ ফিরে তাকাল, কে?

—ও।

উঠতে উঠতে বলল স্বদেশ, ওর একটা নাম আছে অনু। সেটা উচ্চারণেও কি তোমার ঘৃণা হয়? অপরাধ যদি কিছু করে থাকি সে আমি। তার শাস্তিটা ওকে দিও না।

অনু কোন উত্তর দিল না। বারান্দার কোনে গিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর

হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রেলিং ধরে। পঙ্গপালের মত পুরোন কথাগুলো, পুরোন স্মৃতিগুলো এসে ছেকে ধরল ওকে।

কতক্ষণ অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে ছিল অনু ঠিক মনে নেই। হঠাৎ সজাগ হল, ভেতর থেকে গুণগুণ ঘুমপাড়ানী গানের সুর ভেসে আসায়। ভুরু কুঁচকে ঘরের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল চৌকাঠের সামনে।

গুণগুণ সুর থেমে গেল। ফিরে তাকাল স্বদেশ। বলল, কিছু বলবে ?

শ্লেষের একটা ক্ষীণ হাসি ফুটল অনুর ঠোঁটে, না, দেখতে এলাম। তোমার এরূপ এই প্রথম দেখছি কিনা !

স্বদেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর বলল, এর উত্তর আজ তোমাকে দেব না অনু। আজ তুমি খুব সুস্থ নেই। তুমি শোও গিয়ে। আমি ওকে নিয়ে এ ঘরে শুচ্ছি।

বেড-সুইচে ছোট্ট একটু শব্দ হল। অন্ধকারে ভরে গেল ঘর। অন্ধকারের ভেতরই দরজার পাল্লাটা ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল অনু।

আজ তুমি খুব সুস্থ নেই ! না নেই। সত্যিই নেই। অস্বীকার করে না অনু। কিন্তু কেন নেই ?

নিঝুম নিঃসঙ্গ আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই পুরোন অনুযোগটাই ঘুরে ফিরে আসে অনুর মনে। খুব বড় কামনা তো ওর কোনদিনই ছিল না। মা-বাবা মরা দাতুর আদুরে অনুর হয়তো অভিমানটা একটু বেশীই ছিল, কিন্তু অভিপ্সা বেশী ছিল না। ছোট্ট একটা সংসার আর সহজ সুন্দর একটি দাম্পত্য জীবন—সে জীবনের মাথার উপর প্রাসাদের আচ্ছাদনই থাক বা কুটীরের ছাউনিই থাক। কিন্তু সে টুকুওতো ওকে দিতে পারেনি স্বদেশ। বিয়ের পরও ঘরকে ও বাহির করে রাখল, বাহিরকে ঘর। দিনের পর দিন স্বদেশ জনপ্রিয় হয়েছে, দেশ-প্রিয় হয়েছে ঘরকে বঞ্চিত করে। একটি তৃষ্ণার্ত আত্মাকে বুভুক্ষু রেখে। উপেক্ষায়

অপমানিত করে। কি অধিকার ছিল স্বদেশের একটা নিরপরাধ জীবনকে ওর কর্মযজ্ঞের লেলিহান শিখার আহুতি হিসেবে ব্যবহার করার। বিয়ের রাত্রেই স্বদেশ বলেছিল অনুকে, আমার নিজের প্রয়োজন অত্যন্ত কম। প্রয়োজন বোধটাও। আমার কথা তোমার কিছু ভাবতে হবেনা। কিন্তু ঘরের একমাত্র বউ হিসেবে সংসারের সমস্ত দিকে তোমার দৃষ্টি রাখতে হবে। মা বৃদ্ধা, অসুস্থ, মা'র কথা ভেবেই বিয়েতে মত দিয়েছিলাম আমি। দেখ, সেদিক দিয়ে যেন আমার মাথা উঁচু থাকে।

সুঠাম সুন্দর স্বদেশের পাশে শুয়ে স্বপ্নের কাজলটানা লাজুক নম্র চোখদুটো তুলে মাথা নেড়েছিল অনু। স্বামীর এ কর্ত্তব্যবোধে মনে মনে খুসীই হয়েছিল। গর্বিতা হয়েছিল। আর পাঁচজনের মত আধো আধো অর্থহীন প্রেমের ভাষায় ওদের স্মরণীয় রাত শুরু হয়নি বলে তৃপ্তি পেয়েছিল। মনে মনে বলেছিল, তুমি পাশে থাকলে আমি সমস্ত কর্ত্তব্যের ভার বহন করতে পারব।

কিন্তু দশমঙ্গলের শাখার গ্রন্থি খোলার আগে বুঝতে পারল অনু, স্বদেশকে ও পাশে পাবে না। শুধু কর্ত্তব্যের বোঝাটাই পাবে। সত্যিই স্বদেশের জীবনে স্ত্রীর খুব প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সংসারের প্রয়োজন ছিল একজন লোকের। যে মাইনে করা লোকের মত পর হবে না, ঘরেরই একজন হিসেবে সংসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকবে।

স্বদেশ বলত, এটা তোমার অভিমানের কথা অনু।

অনু জবাব দিত না। বুঝত, তর্কে মত পাল্টান যায়, কিন্তু মন পাওয়া যায় না। ছেলেবেলা থেকেই কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক অনু। অভিমানে আরো বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। ওর আত্মভিমান ক্রমেই ওকে স্বদেশের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিল। ও জানে, যে অধিকার জোর করে আদায় করতে হয় তার ভেতর শক্তির প্রশ্নটাই মাথা উঁচু করে থাকে, শান্তি থাকে না। থাকে শুধু অশান্তি আর অসম্মান।

বরং প্রচণ্ড একটা জেদের বশে নিঃশব্দে ও নিজেকে সংসারে বিলিয়ে দিল। চরম স্বেচ্ছা-বঞ্চনার পথ বেছে নিল। বোধহয় স্বদেশকে লজ্জা দেবার জন্যেই। কিন্তু স্বদেশ নির্বিকার। নিরাসক্ত। ওর চোখের সামনে বিশাল দেশ। অনু সেখানে একটি ক্ষুদ্র পরমাণুই।

কিন্তু পরমাণুরও তো প্রাণ থাকে। নিজের একক সত্তায় সেও তো সামগ্রী হতে চায়। সুখ চায়, শান্তি চায়। তাকে পিষে মারবার কি অধিকার আছে আর একজনের। তিলে তিলে নিজের স্বার্থে নিঃশেষ করে দেবার কি অধিকার আছে অন্যের। সেটাও কি স্বার্থপরতা নয়? নির্মমতা নয়?

হ্যাঁ, অনু আজ সুস্থ নেই। কিন্তু সে কার অপরাধে? কার উপেক্ষায়? কার নির্মমতায়?

সারারাত বিনিদ্র অনুকে দেখে দেখে সহানুভূতি ম্লান তারাগুলো এক-সময় বিদায় নিল। রাত সকালের সন্ধিলগ্নে তারাহীন আকাশ তার আগমনী আলোর আভাস ছড়িয়ে দিল।

চোখের জ্বালা আর শরীর ভরা অবসাদ নিয়ে বিছানার উপর উঠে বসল অনু। এ সময়টা বারান্দায় ঝিরঝিরে হাওয়া থাকে।

বিছানায় উঠে বসতেই সামনের দিকে চোখ পড়ল। মাঝের দরজা দিয়ে দেখল সীমা স্বদেশের গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। আবার মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। কৈ, এখনতো স্বদেশের ঘুম ভাঙ্গছে না। অস্বস্তি বোধ করছে না!

ভ্রূ কুঁচকে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার দিকে চলে গেল অনু।

ক্লান্ত স্বদেশের ঘুম ভাঙ্গল বিছানায় রোদ এসে পড়ায়। এত দেরী ওর কোনদিন হয় না। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেল স্বদেশ। কিন্তু পিছনে টান পড়ায় থেমে গেল। দেখল নিদ্রিতা সীমা মুঠ করে ধরে আছে ওর জামাটা। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে গেল স্বদেশ।

অনু রান্নাঘরে উনুনে হাওয়া করছিল। চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল স্বদেশ, জিজ্ঞাসা করল, ঘটিটা কোথায়?

অনু ফিরে তাকিয়ে বলল, দাঁড়াও, দুধটা ঢেলে রেখে দিচ্ছি।

স্বদেশ এগিয়ে এল, ঠিক আছে, আমিই ঢেলে দিচ্ছি।

সন্ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়াল অনু।—বাইরেই দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি।

স্বদেশ একটু অবাক হল। অনু দুধ ঢেলে ঘটিটা এনে চৌকাঠের সামনে রেখে গেল। স্বদেশ ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনুচ্চ-স্বরে বলল, আশ্চর্য।

চোখে রোদ পড়ায় ছোট্ট একটা হাই তুলে চোখ মেলে তাকাল সীমা। চঞ্চল বিস্মিত চোখে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। কি যেন একবার ভাবল, বোধহয় নতুন পরিবেশটা ওর ঘুমন্ত স্মৃতিতে আবছা হয়ে এসেছিল। তারপর উঠে বসল। খাট থেকে নেমে বাইরে এল।

রান্নাঘরে অনুকে দেখে চৌকাঠের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ডাকল, মামণি।

চমকে ফিরে তাকাল অন্যমনস্ক অনু। তারপর কিছুটা আতঙ্কিত ভাবে বলল, এই, এই দাঁড়া।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সীমা। অনু বলল, কি চাও?

সীমা কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। চাপা একটা ভয় ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে। আস্তে উঠে এসে ওর সামনে দাড়াল অনু। স্বর নামিয়ে বলল, এ ঘরে তুমি এস না। আসতে নেই। কি চাই?

চোখ তুলে বলল সীমা, মুক দোব।

—মুখ ধোবে?—আঙ্গুল দিয়ে বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে বলল অনু, ওর কাছে যাও। ঐ ঘরে।

সীমা নিঃশব্দে সরে গেল সেখান থেকে। বাথরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাথরুমে মুখ ধুচ্ছিল স্বদেশ। সীমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল স্বদেশ।—এই কিরে? কাকু বলে ডাকতে বলেছিনা?

সীমা ছলছলো চোখে বলল, আমি বাড়ী দাব।

—বাড়ী যাবে? কেন?

—মামণি বকে! ভালবাছেনা।

স্বদেশ নিরসক্ত ভাবেই বলল, না না বাসে। তুমি বুঝতে পার না। এস মুখ ধুইয়ে দেই।

চা করতে করতে কথাগুলো শুনল অনু। দুটো কাপে চা ঢালল। আর একটা কাপে দুধ। দুধটা ঢেলেও কি যেন ভাবল। তারপর কাপ থেকে দুধটা ঢালতে লাগল একটা রংচঙে কলাইয়ের বাটীতে।

বাথরুম থেকে সীমাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল স্বদেশ। এ নিরুত্তাপ কর্ত্তব্যগুলো আর ভাল লাগছিল না ওর।

ঘরে ঢুকে টেবিলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভুরু কুঁচকে উঠল স্বদেশের।

ওর চায়ের কাপটার পাশে কলাইয়ের বাটীতে সীমার দুধ। সীমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর গিয়ে টেবিলে বসল। সীমাকে একটা টুল টেনে তার উপর বসিয়ে দিয়ে চেষ্টাকৃত চটুল স্বরে বলল, সীমা এখন কি খাবে? চা, না ডুডু?

একটু লাজুক লাজুক হাসল সীমা, চা-আ।

মাথা নাড়ল স্বদেশ, উহুঁ, ডুডু। বড় হলে চা খাবে। —বাটিটা ওর সামনে টেনে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার ডুডু।

নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আড় চোখে একবার সীমার দিকে তাকিয়ে নিল স্বদেশ। যা ভয় করেছিল তাই। সীমার হাসি মিলিয়ে গেছে। থমথমে হয়ে উঠেছে চোখমুখ।

স্বদেশ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি, খেলেনা?

গুম মেরে বসে রইল সীমা। কোন জবাব দিল না।

—কি হল?

সীমা গম্ভীর ভাবে বলল, না, কাবনা।

একটু ধমকের স্বরে বলল স্বদেশ, কেন?

সীমা ঠোঁট উল্টাল, ছাই, দাগ দাগ বাতী। কাপে কলে খাব!

স্বদেশ ওকে ভুলানর চেষ্টা করল, বাঃ কি সুন্দর দাগ দাগ বাটী, খাবেনা কেন? খাও।

বাটীটা হঠাৎ হাত দিয়ে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল সীমা। কিছুটা দুধ চলকে পড়ল টেবিল ক্লথ আর স্বদেশের কাপড়ে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সীমার দিকে ফিরে তাকাল স্বদেশ। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত হয়ে উঠল। সীমা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে মুখে। দুধের বাটীটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল স্বদেশ। সোজা বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের চৌকাঠের সামনে বসে থাকা বিড়ালটার সামনে শব্দ করে নামিয়ে দিল বাটীটা।

ফিরে তাকাল অনু। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, সেকি খেল না?

স্বদেশ গম্ভীর স্বরে বলল, না।

—কেন?

—যে ভিক্ষার মর্য্যাদা বোঝে না, তার দুধ খেতে নেই।

—তার মানে ?

অনুর চোখে চোখ রেখে বলল স্বদেশ, ওরা শিশু তো তাই অবহেলাটা অনেক সময়ই মুখ বুঝে সহ্য করতে পারে না। অভিমান করে। কিন্তু ওকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের আর যাই শোভা পাক, অভিমানটা শোভা পায় না।

কিছুটা তরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল অনু, তা বলে এতটা দুধ নষ্ট করলে ? অভিমানটা না হয় ভাঙ্গিয়েই নিতে !

আঘাতটা জায়গামতই গিয়ে লাগল। স্বদেশের চোখ মুখ দেখে সেটা বুঝল অনু।

দৃঢ়স্বরে টেনে টেনে বলল স্বদেশ, নষ্ট হয়নি, তোমার পুষুকেই দিয়েছি। অবশ্য তোমার কল্পনা করে নেওয়া কোন জাতের ছোঁয়া দুধ খেলে পুষুর জাত যাবে কিনা জানি না। সে ভয় থাকলে খাওয়া হলে ডেক, বাটীটা ধুয়ে দিয়ে যাব।

বলে আর দাঁড়ালনা স্বদেশ। নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেল।

সূক্ষ্ম তৃপ্তির একটা ছাপ ফুটে উঠছিল অনুর মুখে, কিন্তু স্বদেশের ঘরের দিকে তাকিয়েই সেটা মিলিয়ে গেল। আতঙ্কিত, অসহায় একটা করুণ মুখের প্রতিবিম্ব ফুঠে আছে আয়নার উপর। ভাষাহীন একটা করুণ আর্ত্তি যেন।

দুপুরে আফিসে যাবার সময় সীমাকেও পাশে বসিয়ে খাইয়ে দিল স্বদেশ। অনু কোন আপত্তি করল না। বরং একটা সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে খুসী হল।

অফিসে যাবার আগে গোপনে সীমাকে আদর করে বলল স্বদেশ, আমি না আসা পর্যন্ত এই ঘরে আর ঐ বারান্দায় খেলবে কেবল, এ্যাঁ ? মামণির কাছে যাও বুঝি ? মামণির শরীর খারাপ, অসুখ।

সীমা একটু চিন্তিত হল। একটু ভেবে বলল, কি অছুক ? জ্বল ?

স্বদেশ বলল, হ্যাঁ।

—দুধবাল্লি কাবে ?

স্বদেশ একটু হেসে বলল, যা খুসী থাকগে। তুমি কাছে যাবে না, বুঝলে ?

মাথা নাড়ল সীমা, হু-উ-উ ! ভাল হলে দাব ?

স্বদেশ গভীর দৃষ্টিতে সীমার দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বর সেরে গেলে মামণিই তোমাকে কাছে টেনে নেবে। লক্ষ্মী হয়ে থেকো।

সীমা স্বদেশের একটা আঙ্গুল ধরে লাজুক লাজুক হেসে সামনের ঘরের দিকে দেখিয়ে বলল, আমাকে একটা পুতুল দেবে ?

স্বদেশ ঘরের দিকে ফিরে তাকাল। আলমারী ভর্তি পুতুল আর খেলনার লোভানি। অনুর সংরক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল স্বদেশের। সীমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে অনেক দুর থেকে ভেসে আসা স্বরে বলল, তুমি বিড়ালগুলো নিয়ে খেল।

হতাশায় করুণ হয়ে উঠল সীমার চোখ দুটো। স্বদেশ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিস যাওয়ার পথে স্বদেশ একবার দিদির সঙ্গে দেখা কবতে গেল। আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছেন দিদি। হয়তো বিকেলের দিকে সময় নাও হতে পারে দেখা করার।

ঘরের ভেতর পুরী যাবার প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। বাক্স গোছাচ্ছেন দিদি। তাপ্তী সাহায্য করছে। বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে তাপ্তীর একটা কথা কানে যেতে একটু থামল স্বদেশ।

মামীমা কিন্তু বড় বেশী রূঢ় ব্যবহার করে মামার সঙ্গে। কবে কি ঘটেছিল—

দিদি বললেন, কিন্তু ওর দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে। আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করার সাধ তো ওরও ছিল।

তাপ্তী কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, পৃথিবীর সব দেশেই বড় আদর্শের জন্য ছোট সাধ বঞ্চিত হয়। মামাও নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করেনি।

বুঝল স্বদেশ, আদর্শের উত্তাপের সঙ্গে মুগ্ধ জায়া-জননী মনের সেই চিরকালীন দ্বন্দ্ব চলছে ভেতরে। যার উপলক্ষ ও নিজে। প্রসঙ্গটাকে আর এগোতে না দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল তাই।

—আজ রাত্রের ট্রেনেই যাচ্ছ তাহলে ?

দিদি এগিয়ে এলেন, হ্যাঁ। আয়, বস।

স্বদেশ বলল, না বসব না। সময় পেলে বরং অফিস থেকে ফেরার পথে একবার আসবখন। তাপ্তীকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

তাপ্তী এগিয়ে এল, আমাকে ? কী ?

—তুই দুপুরের দিকটা আমাদের ওখানে গিয়ে একটু থাকতে পারবি ? মেয়েটা একা আছে, মানে—

তাপ্তী শান্ত স্বরে বলল, আচ্ছা যাব'খন।

দিদি সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, নতুন করে আবার কি যে এক ঝামেলা বাধিয়ে বসলি সন্থু।

স্বদেশ চোখ নামিয়ে বলল, উপায় ছিলনা দিদি। নানা দিক চিন্তা করেই এনেছিলাম। অনুর কথাটাই বেশী করে চিন্তা করেছিলাম। দেখি, শেষ পর্যন্ত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। যাকগে, সঙ্গে কে যাচ্ছে ?

তাপ্তীই জবাব দিল, পরাণ যাচ্ছে। একটা কাজে হঠাৎ কলকাতায় এসে জগন্নাথ দর্শনের এমন সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় ওতো মহা খুসী।

দিদি বললেন, হ্যাঁ, ওকেও নিয়ে যাচ্ছি। তোদের জামাইবাবুকে তো একটু অসুস্থ অবস্থায়ই নিয়ে যাচ্ছি, সঙ্গে একজন লোক থাকা ভাল।

স্বদেশও নিশ্চিন্ত হল। পরাণ বহু দিনের পুরোন বিশ্বস্ত লোক। দেশে ওদের জমিজমা দেখা শোনা করে। বলল, ভালই তো, যাক। ও থাকলে আর চিন্তার কিছু নেই। গিয়ে চিঠি দিও।

তাপ্তীকে আর একবার ওর কর্ত্তব্যের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল স্বদেশ।

স্বদেশ অফিসে দশটার ভেতর বেরিয়ে গেলেও নিজের খেতে খেতে অনুর অনেক বেলা হয়। ইচ্ছে করেই বেলা করে। টুকটাক এটা ওটা কাজে নিঃসঙ্গ দুপুরটাকে ছোট করে আনে ও।

খেতে ভাল লাগছিল না আজ। শরীরটা ভাল নেই, কেমন যেন ভয় ভয় করছে। অনেকদিন বাধা দিয়ে রাখা অসুখটা আবার মাথা চাড়া না দেয়। মনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই অসুখটা।

খাওয়া হয়ে গেলে অন্য মনস্কেই বাঁ হাত দিয়ে দুধের বাটিটা সামনে টেনে নিল অনু। কিন্তু বাটিটায় ভাত নিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

অনেকক্ষণ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাটিটার দিকে। তারপর বাটিটা সরিয়ে রেখে থালে জল ঢেলে উঠে পড়ল।

সীমা ওর কথা রেখেছিল। মামণিকে ও বিরক্ত করেনি। অবশ্য একেবারে নিঃসঙ্গ ছিল না সীমা। এ বাড়ির আর দুটো প্রাণীর সঙ্গে এর ভেতরই ভীষণ অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল। বিড়াল দুটো বিনা প্রতিবাদে এই ছোট্ট প্রভুটিকে মেনে নিয়েছিল। বেশ মুখ বুজেই সহ্য করে যাচ্ছিল ওর শাসন, সোহাগ।

সীমা একটা বিড়ালকে দুহাতে মুখের কাছে তুলে ধরে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে, মামণির অসুখ সেরে গেলেই ওকে ভালবাসবে। কিন্তু পুষুর চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল না যে, কথাটা ও বুঝেছে কিনা। বা বুঝলেও বিশ্বাস করেছে কিনা। তাই পুষুটাকে বারে বারে ঝাঁকিয়ে বিশ্বাস করানর চেষ্টা করছিল সীমা।

একটু বাদে একটা কাপে করে দুধ নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল অনু। সীমা ভয়ে ভয়ে বিড়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে অনুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

টেবিলের উপর কাপটা রেখে সীমার দিকে ফিরে তাকাল অনু। বলল, খেয়ে নিও।

মাথা নাড়ল সীমা। ভীত স্বরে বলল, না।

—কেন?

—বকবে?

—কে?

—কাকু।

অনু ভুরু কুঁচকাল, ন্যাকামি। কেউ বকবে না, খেয়ে নিও।

বেরিয়ে গেল অনু। নিজের ঘরে চলে গেল। উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সীমা টেবিলটার কাছে। গিয়ে কাপটা হাতে তুলে নিয়েও কি যেন ভাবল। ছোট্ট একটা দ্বিধা ফুটে উঠল চোখে মুখে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। হঠাৎ নজরে পড়ল স্বদেশের দাড়ি কামানর সরঞ্জামগুলোর দিকে। হাত বাড়িয়ে দাড়ি কামানর বাটিটা টেনে নিল। দাগদাগ ছোট্ট একটা কলাইয়ের বাটি। অনেকটা সকালের

সেই বাটিটার মতই। কাপ থেকে দুধটা ঢালতে গেল সেই বাটিটায়।

ও ঘর থেকে প্রায় ছুটে এল অনু।—এই, এই, এরাম, কি করছিস?

চমকে মুখ তুলে তাকাল সীমা। সমস্ত দুধটুকু পড়ে গেল টেবিলের ওপর। টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। পুষুটা দৌড়ে এসে চুক্ চুক্ করে মহা উৎসাহে খেতে শুরু করল দুধটুকু। আতঙ্কে পাংশু হয়ে গেল সীমার মুখ। অসহায় ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও অনুর দিকে।

অনু চৌকাঠের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সহানুভূতিতে, আবেগে মোলায়েম হয়ে এল ওর দৃষ্টি। কিন্তু তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। না না, তা হয় না। এ ওর পরাজয়। স্বদেশের কাছে পরাজয়। নিজের কাছে পরাজয়।

স্বদেশকে রওনা করিয়ে দিয়েই তাপ্তীকে চিঠিতে বিস্তারিত ভাবে সব জানিয়েছিল আনন্দ। অনুরোধ করেছিল, খুব সাবধানে, অবস্থা বুঝে তপ্তী যেন সেতুর কাজ করে ওদের ভেতর। বিশেষ করে অনুর ক্ষেত্রে যেন আরো বেশী সচেতন থাকে। কোন ক্রমই অনুর উপর যেন সীমাকে আরোপ না করা হয়। বরং সীমার দিকেই ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসুক অনু এটাই কাম্য।

তাপ্তীর উত্তর পাওয়ার আগেই কলকাতার ফিরে আসার সুযোগ পেয়ে গেল আনন্দ। ভাপ্তীকে জরুরী চিঠি দিল পত্রপাঠ ওর সঙ্গে দেখা করতে।

দুপুরেই তাপ্তী এসে হাজির। আনন্দ সবে খেয়ে দেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছিল। হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢুকল তাপ্তী।

—যাক, ফিরেছ তাহলে! আমি ভাবলাম বোধহয় সর্বশেষ রুগীটা পর্যন্ত না মেরে ফিরবে না।

আনন্দ সোজা হয়ে বসল, আচ্ছা ওসব পরে শুনব। ওদিককার খবর কি বল?

তাপ্তী গাম্ভীর্য্যের ভান করে বলল, খুলে বলবে তো জাতীয় না অন্তর্জাতীক কোন সংবাদ চাও।

আনন্দ ওর ছেলেমানুষিতে অধৈর্য্য হল, কি মুস্কিল, আরে স্বদেশদাদের খবর জিজ্ঞেস করছি।

তাপ্তী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সুবিধের নয়। খুব বুদ্ধিমানের কাজ করনি বোধহয়।

—কেন?

—মামীমার উপর খুব খারাপ রিএ্যাকসন্ হয়েছে।

আনন্দ একটু চিন্তিত হল।—মেয়েটার সঙ্গে কথাত বলে?

তাপ্তী বলল, মনে হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় মায়ের উপর সত্যিই যতটা বিরূপ, শোধ নেবার জন্যই যেন তার চেয়ে বেশী বিরূপতা প্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করল আনন্দ। এর শুভ-অশুভ সব দায়িত্বই ওর। সংবাদটায় কিছুটা বিচলিত হল তাই। তারপর তাপ্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, চল না একবার ঘুরে আসি।

তাপ্তী একটু ইতঃস্তত করে বলল, কিন্তু আমার যে একটু অসুবিধে আছে।

—কেন?

তাপ্তী মিষ্টি হাসল, শুনলে তো আবার রাগ করবে।

আনন্দ ভুরু কুঁচকে তাকাল, মিটিং?

ছেলে মানুষের মত মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকৃতি জানাল তাপ্তী। বলল, ভীষণ জরুরী।

আনন্দ হাসি চেপে কপট বিরক্তির সঙ্গে বলল, না, এই মিটিংই আমার সতীন হয়ে দাঁড়াল দেখছি। মামাকে দেখেও শিক্ষা হয় না।

তাপ্তী গম্ভীর হয়ে বলল, কেন, ঘরকে স্বীকার করেই দেশকে ভালবাসতে হয়, মামাদের ভুল দেখেই তো এ শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

আনন্দ উঠে দাঁড়াল, এই সেরেছে, এক্ষুনি মাস্-মিটিং এর বক্তৃতা শুরু হবে। চল তোমাকে বরং বাসে তুলে দিয়ে আসি।

আনন্দর ভাষায় ওর গৃহলক্ষ্মী বাচ্চা বাহাদুরটাকে ডেকে ঘরে থাকতে বলে। তাপ্তীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আনন্দ।

অনুর দুপুরগুলো আগে ছিল নিছক নিসঃঙ্গ। যন্ত্রণাদায়ক। এখন আর একটি উপসর্গ এসে যোগ হয়েছে—উৎকণ্ঠা। মেনে নিক না নিক সীমার জন্য একটা ছোট্ট অস্বস্তি সারা দুপুর, স্বদেশ না ফেরা পর্যন্ত, ওকে জড়িয়ে থাকে। এই বোধ হয় বাইরে গেল! এই ছাদে গেল! এই রেলিংএর উপর উঠল! নতুন এক শাস্তি।

এ বাড়ির দুপুরগুলো এখন আর আগের মত নিঃশব্দ নয় সীমার জন্য। অনুর ঘরে অবশ্য আসে না ও স্বদেশের নিষেধের জন্য। নিজের মনে নিজে সারা দুপুর খেলে বেড়ায়। ঘুরঘুর করে বিড়াল দুটোর সঙ্গে। দু-এক সময় অবশ্য অনুর মনোরঞ্জনের জন্যও ক্ষীণ চেষ্টা করে সীমা। কিন্তু বেশীদূর এগোতে সাহস পায় না। অনুর গাম্ভীর্য্যে ধাক্কা খেয়ে অভিমানে আবার বিড়ালগুলোর কাছে ফিরে যায়। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় অনুর, মেয়েটা বোধহয় খুব বেশীদিন মার নৈকট্য পায়নি। একটু ছাড়াছাড়া ভাবেই মানুষ হয়েছে। না হলে হেসেখেলে এভাবে নিজেকে এত সহজে মানিয়ে নিল কি করে নতুন পরিবেশে?

অবশ্য এটা অনেক ছেলেপিলের স্বভাব থাকে। যত অন্তরঙ্গতাই থাক, চোখের বার হলেই মনের বার। খুকু কিন্তু পারত না। একেবারে পারত না। বোধহয় কোনদিন বাবাকে কাছে পায়নি বলেই মাকে ওভাবে আকড়ে থাকত। অথচ সেই স্বদেশ আজ অফিসে যাবার আগে লুকিয়ে সীমাকে আদর করে যায়। রাত্রে ঘুম পাড়ায়। আর, সাহস ওর, মনে মনে কামনা করে অনুও তাই করুক। খুকুকে ভুলে যাক।

চিন্তাটা এখানে এলে স্বদেশকে বড় ছোট মনে হয় অনুর। হীন মনে হয়। নিজের স্বার্থপরতার জন্য অনুকে তো যন্ত্রণা দিচ্ছেই, উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে ঐ নিরীহ মেয়েটাকেও কষ্ট দিচ্ছে।

সীমা বাইরে বিড়ালটা নিয়ে খেলছিল। বিড়ালটা ওর আদরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, টের পাচ্ছিল অনু। বোধহয় মুক্তির প্রথম মুখোসটাই কাজ লাগিয়েছে দুষ্টু টা। ব্যাজার মুখে ঘরে এসে ঢুকল সীমা। আয়নার কাছে এসে একবার নিজেকে দেখল। বিভিন্ন মুখবিকারের প্রতিবিম্ব দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরতে ঘুরতে ঝুল-বারান্দায় গেল, আবার ঘরে ফিরে এল। অনু চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল।

মাঝের দরজার কাছে এসে সীমা একবার অনুর ঘরের দিকে তাকাল। তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ঘরে গিয়ে শব্দ করে চেয়ারটা টানল বার দুই। উঁকি মেরে দেখল অনু ফিরে তাকায় কিনা।

অনু তাকাল না দেখে কি যেন একটু ভাবল সীমা তারপর বারান্দায় চলে গেল, যেদিকে পাশ ফিরে শুয়ে ছিল অনু সেদিকের একটা জানালার কাছে গেল। কিন্তু উঁকি মারতে গিয়েও জানালাটা নাগাল পেলে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা বালতি চোখে পড়ল ওর। সেটা এনে উল্টে বসাল। তারপর জানলার শিক ধরে সেটার উপর উঠে দাঁড়াল। উঠতেই চোখাচোখি হয়ে গেল অনুর সঙ্গে। ফিক্ করে একটু হেসে মাথা নামিয়ে ফেলল সীমা।

বোধহয় মামণির চোখে মুখে প্রত্যক্ষ কোন বিরূপতার লক্ষণ না দেখে কিছুটা সাহস বাড়ল সীমার। আবার ফিরে ঘরে এল। মাঝের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছোট কয়েকটা হাত তালি দিল। ফিরে তাকাল অনু। হেসে দরজার আড়ালে চলে গেল সীমা। ভারী মজার একটা লুকোচুরি খেলা পেয়ে বসল যেন। একটু পরেই উঁকি দিল আবার। অনুর সঙ্গে চোখাচোখি হল। এবার আর মুখ সরিয়ে নিল না সীমা। একটু লাজুক হেসে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করল, আছব?

এ প্রশ্নে হঠাৎ কিছুটা বিচলিত বোধ করল অনু। দরজার মুখে একটা করুণ আর্তি যেন প্রত্যাশী চোখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা নেড়ে নিষেধ করল। মুহূর্তে একটা নিবিড় বেদনার ছায়া পড়ল সীমার চোখে মুখে। জলে টলমল করে উঠল ডাগর চোখদুটো। মাথা নিচু করে সেখান থেকে সরে গেল সীমা।

শেষ পর্যন্ত মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে বিকেলের দিকে একাই চলে এল আনন্দ। দরজা খুলে দিয়ে একটু হাসল অনু, কি, পথ ভুলে নাকি ?

অনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল আনন্দ, ডিউটিতে বাইরে ছিলাম। স্বদেশদা ফেরেনি এখনও ?

ফেরার সময় হয়েছে, এস।

অনুর পিছে পিছে ঘরে এসে ঢুকল আনন্দ। ভাল করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল অনুকে কিন্তু সঠিক কিছু বুঝল না। ওকে বসিয়ে ভেতরে গেল অনু।

ভেতরে যেতে যেতে একটু চিন্তায় পড়ল অনু। যদিও আনন্দ ওদের পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ, তবু সীমা প্রসঙ্গটা চেপে যাবে কিনা বুঝছিল না। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখল, সেটা সম্ভব হবে না। হয়তো উচিৎও হবে না। বরং সত্যি কথাটা বলে দেওয়াই ভাল। কোন রকম উৎসাহ না দেখালেই চলবে।

দরজার ফাঁক দিয়ে আনন্দকে দেখবার চেষ্টা করছিল সীমা। অনুকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, ঐ লোকতা কে ?

অনু শাসনের সুরে বলল, লোকটা বলতে নেই। ও কাকু। ডাক্তার কাকু। যাও, আলাপ কর গিয়ে।

সীমা ঠোট উল্টাল, না, দাকতাল খারাপ। ইনজেনসন্ করে।

অনু বোঝাল, ও ভাল ডাক্তার। ইঞ্জেকসন করে না। যাও।

আনন্দ একটু একটু শুনতে পাচ্ছিল ওদের কথা। ডেকে জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে কথা বলছ বৌদি ?

অনু সীমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, এর সঙ্গে।

আনন্দ দেখে খুসীতে লাফিয়ে উঠল, আরে, সীমা যে ! এস এস। শুনে যাও দেখি।

মনে মনে তৈরী হচ্ছিল, অনু সাজিয়ে গুছিয়ে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে সীমার পরিচয়টা দেবার জন্য। কিন্তু আনন্দ ওকে আগে থেকেই চেনে

দেখে অবাক হল। বুঝল, নাটকের এ নতুন নায়িকাটির পূর্বাপর সমস্ত ইতিহাসই জানে ও। আনন্দের উৎসাহে তাই বিরক্ত হল অনু।

একটু হেসে বলল, ও, তুমি আগে থেকেই চেন দেখছি।

আনন্দর এতক্ষণে খেয়াল হল এতটা উৎসাহ দেখিয়ে ফেলা উচিৎ হয়নি। বলল, হ্যাঁ, আমিও তো স্বদেশদাদের সঙ্গে রিলিফে গিয়েছিলাম। রিয়ালি এ চার্মিং গার্ল, না বৌদি? তোমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

আনন্দের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল অনু। অনুযোগের সুরে বলল, অভাব মিটেছে কিনা জানতে চাইছ বোধহয়?

এই অপ্রত্যাশিত তীক্ষ্ণ প্রশ্নে কিছুটা থতমত খেয়ে গেল আনন্দ। বলল, না, মানে, ঠিক তা নয়—।

অনু পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল আনন্দর দিকে। তারপর টেনেটেনে বলল, কাঁটা দিয়ে সব সময় কাঁটা তুলতে যাওয়া নিরাপদ নয় ঠাকুরপো, তাতে হাতের কাঁটাটা ভেঙ্গে গেলে দ্বিগুণ যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচতে হয়।

শুরুতেই প্রসঙ্গটা এই খাতে চলে যাবে ঠিক ভাবতে পারেনি আনন্দ। অনুর স্বরের রূঢ়তায় কিছুটা ব্যথিত হল। কিন্তু কিছু বলার আগেই অনু বলল, বস, চা আনছি।

অনু বেরিয়ে গেল। সীমার দিকে তাকাল এবার আনন্দ। সীমা চিনতে পেরেছে ওকে। চোখাচোখি হতেই মিষ্টি একটু হাসল সীমা। পকেট থেকে বিস্কুটের ঠোঙ্গা বের করে ইশারায় ওকে ডাকল আনন্দ। সীমা পায়ে পায়ে ওর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। বিস্কুটের ঠোঙ্গাটা খুলে ওর হাতে দিল আনন্দ। তৃপ্তির সঙ্গে বিস্কুট খেতে খেতে আনন্দের দিকে তাকিয়ে বলল সীমা, আমি-না তকুলেতও ভালবাসি।

আনন্দ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আচ্ছা, এর পরদিন চকলেট নিয়ে আসব।

সীমা হাত ছড়িয়ে বলল, এ-ত্তো নিয়েছো, এঁ্যা?

আনন্দ একটু হেসে বলল, হ্যাঁ।

তারপর একটা সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিবেশ এড়ানর জন্যই অনু আসার আগেই বিস্কুটগুলো দিয়ে ওকে ব্যালকনিতে পাঠিয়ে দিল।

চা খেয়ে আর খুব বেশীক্ষণ বসল না আনন্দ। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। কাগজেও দেখেছিল সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া প্রথমেই সুর কেটে যাওয়ায় একা বৌদির মুখোমুখি বসে থাকতে কিছুটা অস্বস্তিও অনুভব করছিল। তাপ্তীকে এজন্যই সঙ্গে আসতে বলেছিল। কিন্তু এত মিটিং করলে কি আর অন্য কাজ করতে পারে কেউ!

অনুও বসার জন্য আর জোরাজোরি করল না। নিরুত্তাপ স্বরে শুধু অনুরোধ করল একবার, আবার এস।

স্বদেশের ফিরতে কিছুটা রাত হল। ইতিমধ্যে সেই সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারের অফিসে খোঁজ করেছিল স্বদেশ। সেখান থেকে কিছু আত্মীয় স্বজনের সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু নিখোঁজ ভদ্রলোক সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ পাচ্ছিল না কোনখানেই। আজ সেই অফিস থেকে ফোন এসেছিল স্বদেশের কাছে, নিখোঁজ পরিবারটির সন্ধান পাওয়া গেছে। পুরো পরিবারটাই অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে।

স্বদেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল, পরিবারের সবারই খোঁজ পাওয়া গেছে?

উত্তর এসেছিল, পরিবার বলতে স্বামী স্ত্রী আর ঐ একটি মেয়ে। সকলেই বেঁচে গেছে।

স্বদেশ তৃপ্তির সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, আমি অবশ্য নতুন একটা সমস্যায় পড়লাম, তবু এটা সত্যিই সুখবর। ওঁদের আমার অভিনন্দন জানাবেন।

অফিস থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি নিখোঁজ ভদ্রলোকের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিল সংবাদটির সত্যতা যাচাই করতে। এবং সংবাদটি সঠিক জেনে খুসী হয়ে ফিরেছিল। অনুকে অবশ্য জানায়নি সংবাদটা। ওদের নিজেদের জীবনে সুসংবাদটা একটা নতুন সমস্যা বলে।

অনুও এ প্রসঙ্গে এ'কদিন কোন প্রশ্ন করেনি। কিন্তু আজ আনন্দ ওকে নতুন করে সজাগ করে দিয়ে গেল, সবাই মিলে একটা অদৃশ্য ব্যূহ

রচনা করছে ওর চারদিকে। শিখণ্ডী সীমা। কে জানে, হয়তো ওর নীরবতা স্বীকৃতি বলেই গণ্য হয়েছে ওদের কাছে। যেটা, ওদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ, আদৌ সত্য নয়।

রাত্রে খেতে বসে জিজ্ঞেস করল অনু, কোন খোঁজ পেলে ?

একটু অবাক হল স্বদেশ। হঠাৎ আজই এ প্রশ্নকে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ বলে মনে হল ওর। তবু সব কথা না ভেঙ্গে বলল, ঠিক সেরকম কিছু পাইনি। চেষ্টা করছি।

বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল অনু, যদি না পাও ?

শান্ত স্বরেই জবাব দিল স্বদেশ, কোন আশ্রম-টাশ্রমে দিয়ে দিতে হবে আর কি।

বলে, অনুর দিকে তাকাল স্বদেশ। অনুর সন্দেহ হল, ওর মুখের রেখায় এ কথার ফলাফল দেখবার চেষ্টা করছে স্বদেশ। আরো বিরক্তির সঙ্গে বলল তাই, সেটা এখন দেওয়া যায় না ?

স্বদেশ খেতে খেতে বলল, হয়তো যায়, কিন্তু—

—মায়া পড়ে গেছে, না ?

স্বদেশ কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে খেয়ে নিতে লাগল। অল্প একটু বাঁকা হাসল অনু, তুমি কিন্তু আজকাল ছেলেপিলের ঝামেলা বেশ সহ্য করতে পার।

স্বদেশ চোখ তুলে তাকাল।—কর্তব্য বলেও তো একটা কথা আছে অনু।

অনু শ্লেষের সঙ্গে বলল, চিরদিনই তুমি খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ !

স্বদেশ বিরক্ত হল। সেটা গোপন করার চেষ্টা না করেই বলল, মনটাকে আর একটু বড় করার চেষ্টা কর।

অনু কিছুটা অবাক হল। এতদিন ওই একতরফা বলে এসেছে, মুখ বুজে শুনেছে স্বদেশ। শুনতে বাধ্য বলে। আজ, অনেকদিন পর, স্বদেশের অসহিষ্ণু উত্তরে মনে মনে চটে গেল অনু। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমাদের মন ছোট, সে কথা অস্বীকার করি না। তোমাদের মত বড় মনের পাশে তাকে আরো ছোট বলে মনে হয় হয়তো। কিন্তু যার জন্য এমন ভেঙ্গে-চুরে তছনছ হয়ে গেছে মন, তার কাছ থেকে এ অনুযোগ আসাও কি খুব বড় মনের পরিচয় ?

এর উত্তরে কোন কড়া জবাব দিল না স্বদেশ। সামান্য ক্ষোভের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, সকলেই তছনছ হয়ে গেছে, অটুট আছি শুধু আমি।

আজ, বহুদিন পর স্বদেশের প্রতিবাদে অনুর একটা স্বীকৃত অধিকারে হাত পড়েছে। শুধু একা বলে যাবার অভ্যাসে ঘা পড়েছে। অনু তাই অনেক বেশী অসহিষ্ণু। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল অনু, সেজন্য দায়ী কে? অন্য কেউ, না তোমার সামর্থের বেশী নাম যশের লোভ?

স্বদেশের অত্যন্ত নরম ও স্পর্শকাতর জায়গায় ঘা পড়ায় হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল স্বদেশ। তীক্ষ্ণ একটা ধমক বেরিয়ে এল মুখ থেকে,—অনু!

মরিয়া হয়ে উঠল অনুও। তীব্র অনুযোগে মুখর হয়ে উঠল ও, অস্বীকার করতে পার, আমাদের সকলের সর্বনাশের চিতার উপর তুমি তোমার খ্যাতির মিনার তুলতে চাও নি? তুমি চাওনি—

—অনু!—ধমক নয়, বিরাট আঘাত সয়ে যাওয়া আহত স্বরে ওকে সচেতন করে দেবার জন্যই ডাক দিল স্বদেশ। তারপর থালা ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

এতক্ষণে সচেতন হল অনু। অনুতপ্ত হল। কিন্তু স্বদেশকে ডাকতে গিয়েও কেন যেন পারল না। হাঁটুর উপর মুখ গুজে অস্ফুট স্বরে কেঁদে ফেলল, তবু কেন, কেন নতুন করে আবার আমার শাস্তি বাড়াতে এলে তুমি। কেন, কেন?

রাত্রে উত্তেজনায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না স্বদেশের। অনেকদিন থেকেই অবশ্য রাত্রে ভাল ঘুম হয় না ওর। নতুন সমস্যাটায় জড়িয়ে পড়ার পর থেকে এ উপসর্গটা আরো বেড়েছে।

অবশ্য কেউ জানেনা এ কথা। অনুও না। শুধু এই ছোট্ট যন্ত্রণাটা নয়, জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা নিঃশব্দে পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে বাঁচতে চায় স্বদেশ। বিনিময়ে আর সবাই সুখে থাক।

বৃষ্টি শুরু হয়েছিল অনেকক্ষণ থেকেই। এবার বাতাস বইতে শুরু করল। বাতাসে ঝড়ের আভাস। হাত বাড়িয়ে পাশের জানালাটা বন্ধ করে দিল স্বদেশ। সীমার মুখের দিকে একবার তাকাল। বৃষ্টির এই ভয়-ছমছম রাত্রিগুলোতে শিশুরা মায়ের বুকের আশ্রয় চায়। অথবা ঠাকুমা-দিদিমার স্নেহের উত্তাপ। মানুষ ঘুমোলে কেমন অসহায় লাগে।

অবশ্য এমনিতেও মেয়েটা অসহায়। ওদের জীবনের এক অসহায় সমস্যা।

অবশ্য এই নিরপরাধ মেয়েটা নিজে যত বড় সমস্যা তার চেয়ে অনেক বড় সমস্যার জট পাকিয়ে তুলেছে ওদের বিস্মৃত দাম্পত্য-অতীতটাকে নতুন করে উস্কে দিয়ে। যে অতীতটাকে আজ সত্যিই ভুলতে চায় স্বদেশ, সে অতীতের সঙ্গে কোন গ্লানি, কোন লজ্জা, কোন কলঙ্ক জড়িত নেই, তবু। যে আদর্শের মশাল সামনে রেখে ও জীবনের যাত্রা শুরু করেছিল সে মশালটা যদি দমকা হাওয়ায় আচমকা নিভে না যেত, যদি একই আলোয় ও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পথ চলতে পারত, তাহলে হয়তো ওর অতীতটাকে ও এভাবে ভুলতে চাইত না। কিন্তু পারেনি তা। যুদ্ধ, দাঙ্গা, বিশেষ করে দেশ বিভাগ আর স্বাধীনতার দর্পনে মানুষের, আদর্শের যে রূপ দেখল তাতে শিউরে উঠল স্বদেশ। আচমকা একটা ভূমিকম্পের ঘোর কাটিয়ে ও যখন প্রকৃতিস্থ অনুভূতি নিয়ে সামনে তাকাল তখন দেখল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় একটা ভবিষ্যৎ। পথ দেখান মশালটা কে যেন নিভিয়ে দিয়ে গেছে। ত্যাগের মন্ত্রে যারা ওর তরুণ রক্তে দোলা দিয়ে ঘর ছাড়িয়েছিল তারা অনেক অনেক দূরে সরে গেছে। নিরাপদ ছাউনিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ও একা। ও নিঃসঙ্গ।

নিজেকে বড় দুর্বল মনে হল এবার স্বদেশের। নতুন করে নিজের হাতে আবার মশাল জ্বালিয়ে ও যাত্রা শুরু করতে পারত না? হয়তো কেউ কেউ পারে, কিন্তু ও পারে নি। নিজের এ দুর্বলতা ও স্বীকার করে না। পৃথিবীতে সবার শক্তি সমান থাকে না, একথা বিশ্বাস করে ও। নিজের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি যন্ত্রণা নিয়ে নিঃশব্দে তাই সরে দাঁড়াল স্বদেশ। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করল না। প্রতিবাদ করল না। একক সত্তার একটা নির্জন দ্বীপে এসে ঘর বাঁধল।

বরং বলা যায় আশ্রয় নিল। ঘর আর বাঁধতে পারল কই? অস্বীকার করে না স্বদেশ, সে দোষও হয়তো ওর। আদর্শের তীব্রতায় ঘরের বন্ধনকে ওরা মনে করত মোহ। ঘরের কেন্দ্রকে স্বীকার করেও যে আদর্শের পরিধি প্রদক্ষিণ করা যায় সে কথা এখন বোঝে, তখন মানত না। মাঝেমাঝে

তাই, চেষ্টা করেও নির্মম হতে হয়েছে। ব্রতের নিষ্ঠার জন্য হরিশ্চন্দ্রের মত স্ত্রী-পুত্র বিসর্জন দিতে হয়েছে।

কিন্তু সে কথা অনুকে বোঝাতে পারে নি স্বদেশ। বোঝানর সুযোগ পায়নি। এ অপরাধ নিজে উপলব্ধি করার অনেক আগেই অনুর মন থেকে নির্বাসিত হয়েছে স্বদেশ।

অতীত সঞ্চরণের অবসন্নতায় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল স্বদেশ। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল ঝড়ের শোসানিতে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল স্বদেশ কিন্তু তাকিয়ে দেখল জানলাগুলো কে যেন আগেই বন্ধ করে দিয়ে গেছে। কে তা বুঝল স্বদেশ। পাশের ঘরের দিকে তাকাল একবার। অনুর বিছানা খালি।

বন্ধ জানালার উপর অবিশ্রাম ছোবল মারছে ঝড়। তীব্র একটা শোসানির শব্দ। আর একটানা বৃষ্টির।

বিছানা থেকে নেমে এল স্বদেশ। পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, দরজার পেছন দিকে ছোট্ট সেই আলমারিটার সামনে বসে অনু। ভেতর সারি বাধা পুতুলের মেলা। ছোট্ট কয়েকটা রংবেরঙের ফ্রক আর প্যাণ্ট।

মনটা ভারী হয়ে এল স্বদেশের। ভবিষ্যতের স্বপ্নে সেই অতীত সংরক্ষণ। নিঃশব্দে আবার নিজের বিছানায় ফিরে এল স্বদেশ।

আগে এ উপসর্গটা এত প্রকট ছিল না। কিন্তু আজকাল ঝড় উঠলেই স্বদেশের বার বার মনে পড়ে সেই ঝড়ের রাতটা। ওদের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্য্যয়ের রাতটার কথা। তাড়াতে চেষ্টা করলেও মন থেকে সরাতে পারেনা সে স্মৃতিটাকে। তাড়া খাওয়া কুকুরের মত একটু সরে গিয়েই আবার স্মৃতিটা তীব্র আক্রোশে ছুটে ছুটে আসে যেন।

সেদিনও দুপুর থেকেই আকাশে ঝড়ের প্রস্তুতি ছিল। এর দু'তিনদিন

আগেই বন্যায় ভেসে গিয়েছে আশেপাশের অঞ্চল। রিলিফে যাওয়া আশু প্রয়োজন। হয়তো দলবল পাঠিয়ে দিয়ে স্বদেশের দু'দিন পরে গেলেও চলত। কিন্তু শুধু বন্যা নয়। কিছুদিন হল চাপা একটা সাম্প্রদায়িকতা ছাই চাপা আগুণের মত ধিকিধিকি জ্বলছিল ওখানে। বন্যার জলে সেটা ভেসে যাওয়া দূরের কথা খোঁচা খাওয়া সাপের মত ফণা তুলে ফুঁসিয়ে উঠল। ছোবল পড়ার আগেই তাই স্বদেশের যাওয়া প্রয়োজন।

ওর থলিটা গোছাচ্ছিল স্বদেশ, সামনে এসে দাঁড়াল অনু।

—তোমার কি না গেলেই নয়?

—কালপরশুই চলে আসব। ভেবনা।

—নিজের জন্য কোনদিনই ভাবিনি। খুকুর এরকম অসুখ তাই—

—সমিতির ছেলেদের বলে গেলাম, ওরা দেখাশুনা করবে। রাত্রে আনন্দ এসে থাকবে। সন্তু আমি ফিরলে যাবে। কাজেই ডাক্তারও তো ডাকের মাথায় থাকল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অনু স্বদেশের দিকে। তারপর টেনে টেনে বলল, বেশ যাও। তোমার দেশের কাজে আমি বাধা দেব না। মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে তোমরা অনেক বড়।

বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়াল অনু। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিরাট দায়িত্বের কথা ঘুরছে তখন স্বদেশের মাথায়। কোনদিকে ওর তাকানর সময় নেই। এক ঘণ্টার ভেতরই বেরিয়ে পড়েছিল স্বদেশ বাড়ি ছেড়ে।

মনের নিভৃততম অংশে এখন প্রশ্ন জাগে স্বদেশের। নিঃস্বার্থ আদর্শই তখন একমাত্র নিয়ামক শক্তি ছিল, নীরব একটা হাত তালির ফল্গু মোহও তার পিছে অদৃশ্য কাজ করে যেত।

স্থাণুর মত আলমারিটার সামনে বসে আছে অনু। প্রতিটি ঝড়ের নিশিপাওয়া রাতে যেভাবে বসে থাকে। শুধুই বসে থাকে। চীৎকার করে কাঁদে না। কাউকে নালিশ জানায় না। অনুযোগে জর্জরিত করে

তোলে না স্বদেশকে। স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে খোলা আলমারিটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। স্মৃতির হাত ধরে পুরোন দিনগুলোর দিগন্তে ফিরে যায়।

সেদিনও দুপুর থেকেই আকাশে ঝড়ের প্রস্তুতি ছিল। শাশুড়ী মারা গিয়েছেন বছর খানেক আগে। একা বাড়িতে হাঁপ ধরে যায় অনুর। স্বদেশ বাড়ি ফেরে অনেক রাত্রে। কোন কোন দিন ফিরতে পারে না। সমিতির ছেলেরা এসে শোয়।

সেদিনও বিকেলে এসেছিল আনন্দ, বৌদি, আজ রাতে আমি এসে থাকব। ভয়ের কিছু নেই। একটু দেরী হলেও ভাববেন না, আমি ঠিক আসব।

ম্লান হেসেছিল অনু, না ভাই, দরকার হবে না। তোমরা বরং রিলিফে যেতে পারলে যাও। দেশের কাজ!

আনন্দ অবাক হয়েছিল, সেকি, আপনি একা থাকবেন, ভয় করবে না?

সেই হাসিরই রেশ টেনে জবাব দিয়েছিল অনু, দেশের নেতা যারা তাদের বৌদের কি অত সহজে ভয় পেলে চলে? তারা সব সময়েই একা।

তবুও আপত্তি জানিয়েছিল আনন্দ, না, না, তা হয়না। স্বদেশদা বারে বারে বলে গিয়েছে।

এবার গম্ভীর হয়েছিল অনু। দৃঢ়স্বরে বলেছিল, বলছি ত দরকার হবে না। ওর কর্ত্তব্যজ্ঞান বেশী কিনা, সবটাতেই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে। দরকার হলে আমি খবর দেব।

আনন্দ কোন প্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি আর। শুধু বলেছিল, আমি ঐ সমিতি ঘরেই থাকছি। দরকার হলেই খবর দেবেন কিন্তু।

আনন্দ চলে গেলেও দরজার কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল অনু। তারপর ঘরে ফিরে এসেছিল খুকুর সাড়া পেয়ে।

ঘুম থেকে জেগে ফোঁপাচ্ছিল খুকু। মাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, মামণি, বাবা কোথায় ?

অসুস্থ খুকুর মাথার কাছে এসে বসেছিল অনু। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, দেশের সেবা করতে গেছে। তুমি ঘুমোও।

কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুমোতে পারেনি অনু। রাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগ বেড়েছিল। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে এমনি করেই শোনাচ্ছিল ঝড়ের শব্দ। এমনি করেই ছোবল মারছিল বন্ধ জানালা-গুলোর উপর।

অসুস্থ আতঙ্কিত খুকুকে কোলের ভেতর জাপটে নিয়ে নিশ্চলভাবে বসেছিল অনু। ভয়ে দুরুদুরু কাঁপছিল বুক। সন্তু ডাক্তারকে চীৎকার করে ডাকতে পারত। ডাকে নি। আনন্দকেও ভিজে ভিজে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে পারত। কিন্তু যায় নি। কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। প্রচণ্ড একটা ক্ষোভ থেকে জাগা জেদ। বাইরের এ ঝড় যেন ঝড় নয়, স্বদেশের নির্মম রূঢ় অত্যাচার। বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করে ও পরাজিত করবে স্বদেশকে ! ওর চোখ ফোটাবে। ওকে লজ্জা দেবে।

সীমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ-ঝিলিক আর ঝড়ের শোসানিতে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চোখ বুজে পড়ে ছিল সীমা। দু'হাতে মুঠ করে ধরেছিল স্বদেশের কাপড়ের খোঁটটা। আর জেগে জেগেই যেন দুঃস্বপ্ন দেখছিল স্বদেশ।

আজকের মতই সেদিনও প্রাইমারী স্কুলের একটা ঘরে জেগে শুয়েছিল স্বদেশ। ক্লান্তিতে সহকর্মীরা সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। যাদের ঘুম আসছিল না তারাও চোখ বুজে ঘুমের সাধনা করছিল। প্রাইমারী স্কুলটা পাকা। সেদিক দিয়ে নির্ভয় ছিল সকলেই। ঝড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপরাধ বোধটাও বাড়তে লাগল স্বদেশের। বুঝতে পারল এই

দুর্যোগে এ ভাবে একা ফেলে আসা উচিত হয় নি অনুদের। ঘর দুয়ার খুব পোক্ত নয়। খুকু অসুস্থ।

বোধহয় ওর সেই মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আচমকা খুকুর মুখটা বারে বারে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল ওর চোখের সামনে। আদর প্রত্যাশী অসুস্থ একটা কচি মুখ।

উঠে বসল স্বদেশ। কিছুক্ষণ হাঁটুর খাঁজে থুতনি রেখে চিন্তিত ভাবে বসে থাকল। রাতের দিকেই সাধারণত অসুখ বাড়ে। যদি কোন কারণে সন্তুকে না পায়? ঝড়ের রাতে যদি কোন ডাক্তার আসতে রাজী না হয়। অনু একা তাহলে কি করবে?

উঠে দাঁড়াল স্বদেশ। ঘরের ভেতর অস্থির ভাবে পায়চারী শুরু করল। বারে বারে মনে হল, অন্যায় করেছে। ভুল করেছে।

স্বদেশের শিলা-সত্তায় সেই বোধহয় প্রথম ফাটল।

অনুই সে রাতে পরাজিত হল শেষ পর্যন্ত। পরাজিত হল খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ ঝড়টা যেন তাণ্ডব শুরু করল। ঘরটা কেঁপে উঠল। বিদ্যুতের হিংস্র শ্বাপদজিহ্বা শিকার সন্ধানে লকলকিয়ে বেড়াতে লাগল ঘরের ভেতর। ভয়ে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল খুকু অনুকে। অস্ফুট চীৎকার করে উঠল, ভয় করে!

ঘরটা এবার দমকা হাওয়ায় মচমচ করে উঠল। প্রচণ্ড শক্তিতে ঝড় দু'হাতে যেন চালটাকে টানাটানি শুরু করল আলগা করে ফেলার জন্য। দরজার খিলটা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হল। পাগলের মত খুকুকে বুকে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল অনু। খুকুকে বাঁচাতে হবে। খুকুর জন্য বাঁচতে হবে।

বিরাট শব্দ করে চালটা উড়ে গেল। জয়ের উল্লাসে ঘরের ভেতর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝড়। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল অনু। খুকুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে পড়ল! দূরে অনেক দূরে অন্ধকারের ভেতরই একটা ক্ষীণ আলো এগিয়ে আসছে দেখা গেল। দূরাগত একটি ক্ষীণ চীৎকারও শোনা গেল, বৌদি!

নিজের অজান্তেই চীৎকার করে সাড়া দিল অনু, আ-ন-ন্দ!

ঝড়ের দমকা হাওয়ায় ভেসে গেল সে ডাক। আপ্রাণ শক্তিতে খুকুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে ঝড় ঠেলে এগোতে লাগল অনু। দূরের

আলোটা এবার কাঁপতে কাঁপতে অনেক কাছে এসে পড়েছে। আবছা আবছা একটা ভৌতিক ছায়াও দেখা যাচ্ছে আলোটার পিছে। এবার ছুটতে শুরু করল অনু।

আর একটা দমকা বেগ এল ঝড়ের। প্রচণ্ড শব্দে বিরাট একটা গাছ উপড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই তীব্র তীক্ষ্ণ একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল। আর ঝড়ের গর্জন।

পরদিন সকালে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল স্বদেশ। বলে গিয়েছিল বিকেলেই ফিরে আসব। কিন্তু আসতে পারেনি। কোন বিকেলেই আর ওখানে ফেরা হয় নি স্বদেশের।

ঝড় যে কাল রাতে কি প্রচণ্ড জান্তব রূপ ধারণ করেছিল সেটা টের পেল স্বদেশ পথে নেমে। চারপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার বিধ্বংসী শক্তির ছাপ। হন্‌হন্‌ করে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল স্বদেশ।

কিছুদূর যাওয়ার পরই হঠাৎ পেছনে ডাক শুনল, স্বদেশদা!

থেমে পড়ল স্বদেশ। মহকুমা সহর থেকে এসে মেশা রাস্তাটার দিকে ফিরে তাকাল। দেখল তীরের বেগে সাইকেলে এগিয়ে আসছে আনন্দ। ওর সামনে এসে ব্রেক চেপে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল আনন্দ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোমাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম। ডাক্তারদা এক্ষুনি তোমাকে একবার সদর হাসপাতালে যেতে বলেছেন।

আতঙ্ক ফুটে উঠল স্বদেশের চোখে মুখে। জিজ্ঞেস করল, কেন? কি হয়েছে?

একটু আমতা আমতা করল আনন্দ, তুমি সাইকেলটা নিয়েই চলে যাও স্বদেশদা। আমি হেঁটে যাচ্ছি।

সাইকেলটা হাতে নিয়ে স্বদেশ আনন্দের দিকে সোজা তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আবার, ওরা কেমন আছে আনন্দ?

আনন্দ মাথা নীচু করল। নীরব উত্তর। দ্রুত সাইকেলে উঠে বসল স্বদেশ। তীর বেগে এগিয়ে চলল সাইকেল।

হাসপাতালের সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল সন্তু ডাক্তার ও সমিতির কয়েকজন ছেলে। স্বদেশকে দেখে গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল সন্তু ডাক্তার, আসুন।

সমিতির একজন ঠেলে এগিয়ে এসে স্বদেশের হাত থেকে সাইকেলটা নিল। দ্রুত চোখ তুলে তাকাল স্বদেশ সন্তুর দিকে, ডাক্তার, কি হয়েছে?

সন্তু বলল, আসুন, বৌদি একটু অসুস্থ।

—খুকু?

সন্তু মাথা নিচু করল।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল স্বদেশ, কি হয়েছে বল, আমি শক্তই আছি।

আবার চোখ তুলে তাকাল সন্তু। —কাল ঝড়ে, গাছ চাপা পড়ে—।

চাপা একটা আতঙ্কে চমকে উঠল স্বদেশ, গাছ চাপা পড়ে—? গাছ চাপা পড়ে কি হয়েছে?

সন্তু অনুতপ্ত স্বরে বলল, দোষ অবশ্য আমাদেরও। আমিও একটা কল পেয়ে বাইরে গিয়ে আটকে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি—।

বিহ্বলস্বরে জিজ্ঞেস করল স্বদেশ, তাহলে কি খুকু নেই?

সন্তু স্বদেশের হাত ধরল, বৌদিকে দেখবেন আসুন।

নিঃশব্দে সন্তুর পিছে পিছে এগিয়ে গেল স্বদেশ। নিজেকে অবিচলিত রাখবার আপ্রাণ চেষ্টায় চোয়ালের হাড়দুটো শক্ত হয়ে উঠল ওর।

বন্ধ কেবিনের দরজা খুলে স্বদেশকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সন্তু। চোখ বুজে বিছানায় পড়ে আছে অনু। পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মুখে বিরাট একটা ক্লান্তি ও যন্ত্রণার ছাপ। বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে অনুকে লক্ষ্য করছিলেন একজন বৃদ্ধ ডাক্তার। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন। স্বদেশকে দেখিয়ে সন্তু ডাক্তারকে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ গুপ্ত?

সন্তু মাথা নাড়ল। নমস্কার করল স্বদেশ। ডাক্তার অভয় দেবার স্বরে বললেন, সেন্স ফিরেছে, ভয়ের কিছু নেই আর।

অনুর দিকে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে ইসারায় সন্তুকে ডাকলেন ডাক্তারবাবু। এককোণে গিয়ে ওঁদের কি যেন একটু আলোচনা হল। তারপর সন্তু এসে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল স্বদেশকে। এক কোণে নিয়ে গিয়ে বলল, স্বদেশদা তোমাকে আর একটা ছোট্ট খবর দেবার আছে।

ম্লান হাসল স্বদেশ, ছোট বড় যে কোন খবর নির্ভয়ে দিতে পার সন্তু। মনকে আমি তৈরী করে নিয়েছি।

সন্তু বলল, আপনাকে হয়তো এখুনি খবরটা না দিলেও চলত। কিন্তু আপনি এসেই পড়েছেন যখন, আর পেসেণ্টও আউট অফ্ ডেঞ্জার। তখন দু-চারটা কাগজে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে রাখাই ভাল।

—ঠিক বুঝছি না সন্তু, একটু খুলে বল।

সন্তু একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল স্বদেশের দিকে। তারপর বলল, বৌদিকে আহত অবস্থায় এখানে আনা হয়েছিল। জ্ঞান ছিল না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সি ওয়াজ ক্যারিং। অ্যাক্সিডেণ্টটা এমন একটা ট্রাবল্স-এর সৃষ্টি করল যে বৌদিকে বাঁচানর জন্যই একটা অপারেশন এসেনসিয়াল হয়ে পড়ল।

—অপারেশন হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি না থাকায় বাধ্য হয়ে আমিই লোকাল গার্জিয়ান হিসেবে ফর্মে সই করে দিয়েছিলাম।

এ জন্য এত সঙ্কোচ বোধ করছে কেন সন্তু ঠিক বুঝল না স্বদেশ। বলল, ভালই করেছ। এতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে ?

কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছিল সন্তু। আরো কিছু একটা বলার জন্য তৈরী করছিল নিজেকে। স্বদেশ বুঝতে পেরে নিজেই জিজ্ঞেস করল, আর কিছু বলবে ?

একটু ইতস্তত করে বলল সন্তু, অপারেশন করতে গিয়ে একটা সমস্যায় পড়তে হল। দেখা গেল অপারেশন সাক্সেসফুল করতে হলে পেসেণ্টের মাতৃত্ব-সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। বৌদিকে বাঁচানর জন্য, তাতেও আমি মত দিয়েছিলাম।

একটু চমকে উঠল স্বদেশ, সে কি ?

সন্তু মাথা নিচু করল, আই বেগ টু বি এক্সকিউজড্। বাট্ আই হ্যাড্ টু ডু ইট্ টু সেভ্ হার লাইফ। অবশ্য আমি জানি না, ভুল করেছি কিনা

এই প্রথম ওরা স্বদেশকে বিচলিত হতে দেখল। মুখটা ফিরিয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চেপে চেপে বলেছিল স্বদেশ, না, সব ভুল আমার ডাক্তার, সব ভুল আমার।

সেদিনটা স্বদেশের কাছে এখনও গতকালের মত স্পষ্ট। পুরো চেতনা দিয়ে যেন ছোঁওয়া যায় তাকে। অনুভব করতে পারে তখনকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

অনুভূতিগুলোকে। সন্তুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই খবর পেল ওরা অনুর জ্ঞান ফিরেছে। শঙ্কিত হল স্বদেশ। সঙ্কুচিত হল। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ানর মত জোর পেল না পায়ে। সন্তুই বলল, আসুন স্বদেশদা। আপনাকে সামনে দেখলে মনে জোর পাবে হয়তো বৌদি। কিন্তু সাবধান, এখনই যেন ও ব্যাপারটা টের না পায়।

সন্তুর পিছে পিছে অনুতপ্ত পায়ে অনুর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বদেশ। মনে মনে কয়েকটি কথা গুছিয়ে নিয়েছিল ওকে অভয় দেবার জন্য। সান্ত্বনা দেবার জন্য।

কিন্তু তার প্রয়োজন হল না। ওদের পায়ের শব্দে অনু চোখ তুলে তাকাল। হঠাৎ ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে এল স্বদেশের মুখের ওপর। তীক্ষ্ণ, তীব্র, হয়ে উঠল আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা। তারপর ওদের ধমক দিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল অনু, ও কেন? ওকে সরিয়ে দাও। ও মেরে ফেলবে। খুকুকে খুন করবে ও।

সন্তু ডাক্তার দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।—নার্স। আবার জ্ঞান হারাল অনু। পুরো দুদিন পর জ্ঞান ফিরল। কিন্তু ফিরল নতুন একটা অসুখ নিয়ে। হিস্টিরিয়া।

খুকুর একটা ফ্রক দাঁতে চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল অনু। সেই ঝড়ের রাতের খুকুর আতঙ্কিত অসুস্থ মুখটা ভেসে ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। আর সেই আর্ত্ত চীৎকার।

প্রচণ্ড শব্দে কাছা কাছিই কোথায়ও একটা বাজ পড়ল বোধ হয়। সীমার ছোট্ট আতঙ্কিত মনের উপর তখন সেই ভয়ঙ্কর রাতটার স্মৃতি গর্জন করে ফিরছিল। বাজের আচমকা শব্দে চীৎকার করে বিছানার উপর উঠে বসল সীমা। অন্ধকারেই স্বদেশকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠল, মা-মণি!

স্বদেশ দ্রুত উঠে বসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে।

আলমারীর সামনে বসে হঠাৎ চমকে উঠল অনু। এ কার ডাক! এ আতঙ্কিত স্বর যে ওর চেনা! একটা আচ্ছন্ন স্মৃতি দ্রুত উঠে দাঁড়াল

ঘরের মেঝেতে। ছুটে এল এ ঘরের দিকে। স্বদেশ ততক্ষণে বেড্ সুইচ্ টিপে দিয়েছে। আচমকা আলোয় ঝকমকিয়ে উঠেছে ঘর।

চৌকাঠের সামনে এসে বাস্তবের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল অনু। দু'হাতে দরজার কপাটটা মুঠ করে ধরল। দরজার গায়ে মাথাটা যন্ত্রণায় ঘষতে লাগল। আর ছোট্ট একটা অস্ফুট বিলাপ, না, না, না।

দ্রুত পায়ে স্বদেশ গিয়ে ধরে ফেলল অনুকে। স্বদেশের হাতের ভেতরই আচ্ছন্নের মত এলিয়ে পড়ল অনু।

কাল রাত্রেই ঝড়টা কেটে গেছে। আজ সকালে আকাশ নির্মেঘ। বৃষ্টি ধোয়া নরম রোদে ভারী মিষ্টি লাগছিল আনন্দর, সকালটাকে। অনেকক্ষণ জানলার কাছে ইজিচেয়ার পেতে চুপ করে বসেছিল তাই। তারপর একসময় সামনের বাড়িতে রেডিওর সময় সংকেতে খেয়াল হল রোদের চেয়েও আপাতত জরুরী প্রশ্ন রুজি। কাজে বেরুতে হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠল আনন্দ। হিটারে চায়ের জল চাপাল। বাচ্চা বাহাদুর বাজার করতে গেছে। বরং বলা যায়, বেরিয়েছে, ফেরার পথে বাজারটাও করে আসবে। কারণ ওর বহির্গমণ ও প্রত্যাবর্ত্তন সম্পূর্ণ ওর মেজাজের উপর নির্ভর করে। কাজের উপর নয়।

কেটলিতে জল ফোটা দেখতে আনন্দর ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ ভাল লাগে। শব্দ ও বাষ্পের মিলিত রূপটাকে একটা নিরুদ্ধ আবেগের আকুতি বলে মনে হয়। অন্যমনস্কে কেটলিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আনন্দ। সশব্দে ঘরে এসে ঢুকল তাপ্তী।

—ডাক্তার, একটু চল তো, একটা রুগী দেখে আসবে।

আনন্দ তাপ্তীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে আর এক কাপ জল কেটলিতে ঢালতে ঢালতে বলল, তোমার পার্টির বিনে পয়সার রুগী তো? ও পারব না বাবা, এখনও বউনি হয়নি।

তাপ্তী বিছানার উপর বসে হেসে বলল, আচ্ছা চলতো, না হয় তোমাকেও পার্টির মেম্বার করে নেওয়া যাবে।

আনন্দ হাত জোর করে বলল, মাপ কর বাবা, হাওয়া খেয়েতো আর সংসার চলবে না।

স্বদেশ চিন্তান্বিতভাবে আনন্দর ঘরের দিকেই আসছিল। ওদের হালকা আলাপ শুনে দরজার কাছে থেমে গেল। ওদের সম্পর্কের ভেতর কোন গোপনতা নেই, আবিলতা নেই জানে স্বদেশ, তবু কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল!

তাপ্তী বলল, কেন, যারা রাজনীতি করে তারা বুঝি সংসার করে না? আর ভারীতো একজনের সংসার তার আবার চিন্তা কত!

কেটলির ঢাকনার শব্দ শুনে তাপ্তী হিটারের দিকে এগিয়ে গেল। আনন্দ একটু ইংগিতপূর্ণভাবে বলল, কিন্তু চিরদিনতো আর একজনের থাকবে না।

এভাবে আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ শুনতে সঙ্কোচ বোধ করল স্বদেশ। সুযোগ বুঝে এবার ভেতরে ঢুকল। আনন্দ একটু অবাক হল, আরে, স্বদেশদা যে! কি খবর, অফিস নেই?

স্বদেশ চেয়ারে বসতে বসতে বলল, তোমার সঙ্গে একটা আলোচনার জন্য এসেছিলাম।

তাপ্তী কেটলি নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, মামা, চা খাবেতো?

স্বদেশ তাপ্তীর দিকে ফিরে তাকাল। ওর এই সহজ সরল স্বাভাবিক রূপটা বড় ভাল লাগল স্বদেশের। অথচ তাপ্তীও তো রাজনীতি করে! মাথা নেড়ে বলল, খাব।

আনন্দ বলল, কি কথা আছে বলছিলে, বাইরে যাবে?

—না, সেরকম গোপন কিছু নয়। কাল খবর পেলাম সেই সেটেলমেণ্ট অফিসার ভদ্রলোকরা সকলেই বেঁচে গেছেন। এখন কি করা যায় বল?

আনন্দ চিন্তিত হল। তারপর স্বদেশের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন, বাড়ীতে অসুবিধে হচ্ছে?

স্বদেশ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তাছাড়া, বিশ্বাস কর, আমি আর পারছি না আনন্দ। সত্যিই মেয়েটার হাত থেকে এবার মুক্তি চাই আমি। তুমি বরং একটা আশ্রম-টাশ্রমের খোঁজ কর।

কিন্তু এত সহজেই পেছ-পা হতে রাজী হলনা আনন্দ। সব কিছু শুনে

ওর নিজেরও মনে হয়েছে, বৌদির মেয়েটার উপর যত রাগ তার চেয়ে অনেক বেশী রাগ স্বদেশের উপর। হয়তো মেয়েটা স্বদেশের মাধ্যমে না এসে আপনি এসে জুটলে এতদিনে আপন করে নিত ওকে।

তাপ্তী চা এনে দিল। তাপ্তীকে সামনে রেখেই আনন্দ ওর সব কথা স্বদেশকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করল। তাপ্তীও যোগ দিল আলোচনায়। কোন কথা না বলে শুধু শুনে গেল। তারপর আনন্দর প্রস্তাবেই সাময়িক স্বদেশ ভাবে রাজী হল। আর ক'টা দিন দেখা যাক। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

আনন্দ দরজা পর্যন্ত স্বদেশের সঙ্গে সঙ্গে এল। দরজার কাছে এসে হঠাৎ আনন্দর দিকে ঘুরে দাঁড়াল স্বদেশ। আনন্দর দিকে সস্নেহ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রায় স্বগত স্বরে বলল, তোমাদের দেখে আমার ঈর্ষা হয় আনন্দ। নিজেকে আরো বেশী অপরাধী বলে মনে হয়।

বলেই দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাড়িয়ে থাকল আনন্দ।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে কাল রাতের কথা ভাবছিল অনু। ঝড়ের রাতগুলেকে ভীষণ ভয় ওর। চরম বিতৃষ্ণা। ওরা শুধু যন্ত্রণা বাড়ায়; সান্ত্বনা দেয় না। শিথিল অনুভূতিগুলোকে নির্মম হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেয়। তারপর যেন অট্টহাসিতে ওর করুণ স্মৃতির টুকরোগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। ওকে ক্লান্ত করে। শ্রান্ত করে। অসুস্থ করে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঘড়ি দেখছিল অনু। খবরের কাগজের তারিখটা মিলিয়ে দেখছিল। এবং কাউকে জিজ্ঞেস না করেই বুঝেছিল, এবার ওর অসুস্থতার ঘুম ভাঙ্গতে দিন কয়েক দেরী হয়েছে। কাল রাত্রেও চেতনা হারায়নি ও, ঘুমিয়ে পড়েছিল শুধু। তাহলে কি ও আগের চেয়ে অনেক সুস্থ হয়েছে? উত্তেজনা সইতে পারার মত সবল হয়েছে মন? শোক নাকি সময়ের স্রোতে ক্ষীণ হয়। একি তাই? নাকি মনের

অজ্ঞাতে সব হারানর হাহাকার কিছু পাওয়ার না-বোঝা তৃপ্তিতে স্নিমিত হচ্ছে? সে পাওয়া কী? কী পাওয়া? মনে মনে হাতরায় অনু।

এক সকালের রোদেই সীমার কাল রাতের স্মৃতি শুকিয়ে গিয়েছিল। দিব্বি নিজের মনে রোজের মত এতক্ষণ খেলছিল ও বিড়ালগুলো নিয়ে। তারপর ঘুম আসাতে মেঝের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হাতটা ভাঁজ হয়ে পেটের তলে পড়েছে। এলোমেলো চুলগুলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে মুখের উপর। একটা অসহায় অবহেলিত আকুতি ছড়িয়ে আছে যেন।

সূত্র পেয়ে অনেকদিন আগের একটা দিনের কথা মনে পড়ে অনুর। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের একটা দুপুর। জ্বর হয়েছিল খুকুমণির। ছটফট করছিল দিনের ও দেহের তাপে। তবু খুকুকে রেখে রান্না করতে গিয়েছিল অনু। সমস্ত মনটা খুকুর কাছে পড়ে থাকা সত্বেও সারস্বরে রান্নার আয়োজন করতে হয়েছিল। কলকাতা থেকে তিনচারজন নেতা আসছিলেন। এখানেই খাবেন ওঁরা। রান্নাঘর থেকে বারে বারে উঠে গিয়ে দেখে আসছিল খুকুকে।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর ঘুম ভাঙ্গল খুকুর। কিছুতেই একা থাকতে চাইল না। কাঁদতে শুরু করল। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর স্বদেশকে গিয়ে বলল অনু খুকুর কাছে এসে একটু বসবার জন্য। স্বদেশ কি যেন লিখছিল। কাগজ কলম নিয়ে এঘরে এল। খুকু বাবাকে দেখে চুপ করল। কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে রান্না করতে গেল অনু।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খুকুকে দেখে চমকে উঠল। কখন যে গরমে বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছে খুকু। সদ্য জল দিয়ে ধুয়ে যাওয়া মেঝের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, একটা হাত বুকের তলে চাপা পড়েছে। চুলগুলো শীর্ণ মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটা অসহায় অবহেলিত আকুতি ছড়িয়ে আছে যেন মেঝের উপর। স্বদেশ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে রিপোর্ট লিখে যাচ্ছে।

অনেকদিন পর ধৈর্য্য হারিয়েছিল অনু। প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল, তুমি কি মানুষ, না কী?

ফিরে তাকিয়েছিল স্বদেশ। অনু ততক্ষণে খুকুকে কোলে তুলে নিয়েছে। অপরাধটা কি ঠিক বুঝতে পারল না স্বদেশ। বলল, কেন ?

—জ্বরের মেয়েটা ভিজে মেঝের উপর পড়ে আছে আর তুমি—কথা শেষ করতে পারল না অনু। উদ্গত কান্নাটা চাপতে চাপতে দ্রুত পায়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। ডালটা পোড়া না লাগে !

যেতে যেতেও একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল অনু, স্বদেশ আবার লেখায় ডুবে গিয়েছে।

সেদিন স্বদেশকে পাষাণ, হৃদয়হীন মনে হয়েছিল অনুর।

হৃদয়হীন ! কিন্তু আজওতো মেয়েটা অসুস্থ না হলেও সেই একই ভঙ্গীতে পড়ে আছে। শিশুরা কি মানুষের হৃদয় বিচার করতে পারে ? ওকি পারে অনুর, স্বদেশের মনোলিপি পুরো পাঠ করতে ? পারেনা নিশ্চয়ই। শিশুরাই বা কেন, আমরাই কি পারি ? নিজেরাই কি সব সময় পারি নিজেদের মনোলিপি উদ্ধার করতে ? চিন্তাগুলো কেমন যেন ছড়িয়ে যায়। পরিবেশ ভেদে জড়িয়ে যায়। পাত্র ভেদে জট পাকিয়ে নিজেদেরও বিভ্রান্ত করে। কার্য্য কারণ খুঁজে পাইনা। অথচ জটিল চিন্তাগুলোর ধাক্কায় নিজেদের অলক্ষ্যে নিজেরা চালিত হই। না হলে ওকে কেন আমি শাস্তি দেই ? যাকে জীবনে কোনদিন দেখিনি। পরিচয় জানিনা। অন্য ভাড়াটেদের ঘরের হলে যাকে আমি হয়তো লুকিয়ে আদর করতাম !

হ্যাঁ, লুকিয়ে আদর করতাম। কেন জানিনা, আজকাল সামনা-সামনি কাউকে আদর করতে পারিনা আমি। বড় ভাগ্নীর মেয়েটাকে লুকিয়ে চুমু খাচ্ছিলাম, ভাগ্নী দেখে ফেলেছিল। ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম। এবং কেন লজ্জা পেলাম ভাবতে বসে আরো সঙ্কুচিত হয়েছিলাম। বিরক্ত হয়েছিলাম। এগুলোকেই কি ইংরাজীতে কমপ্লেক্স বলে ? জট পাকানো চিন্তা প্রসূত কারণ খুঁজে না পাওয়া অভ্যেস !

ঘুমের ভেতরই একবার নড়েচড়ে উঠল সীমা। হাতটা আরো দুমরে ভেতরে চলে গেল। নিশ্চয়ই ব্যাথা পাচ্ছে না। তাহলে ঘুম ভেঙ্গে যেত। না কি ব্যাথা পাচ্ছে বলেই ঘুম ব্যাহত হচ্ছে ? দেখতে কেমন

যেন মায়া বোধহয়। নিজেরই অস্বস্তি বোধহয়। উঠে বসে অমু। ও ঘরে যায়। কিন্তু আবার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে ও।

সীমা ঘুমের ভেতরই আর একবার পাশ ফিরে শুল। দুটো হাতই বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে পাশে ছড়িয়ে দিল। স্বস্তি বোধ করল অমু। দায় মুক্ত হল যেন।

নিজের ঘরে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল অমু। বোধহয় কালরাতের ক্লান্তির জন্যই অনেকদিন পর হঠাৎ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল তারপর।

একটু বাদেই সীমার ঘুম ভাঙ্গল। উঠে বসল ও মেঝের উপর। বার দুই হাই তুলল। ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাইরে গেল। সেখান থেকে ব্যালকনিতে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

রাস্তাটা এখন ফাঁকা। কুকুরগুলো শুয়ে আছে বাড়ীর ছায়াতে। থালা বাজাতে বাজাতে কি যেন বলতে বলতে চলে গেল একটা লোক। কতদূর চলে গেল কে জানে। আবার সব চুপচাপ। একটু বাদেই একটা লোক এল বেলুন নিয়ে। বেলুন বাঁশী বাজাতে বাজাতে। সীমার চোখ দুটো লোভে ঝিকমিক করে উঠল। মিষ্টি মিষ্টি হাসি ফুটল মুখে। আস্তে একবার ডাকল, এই। বেলুনওয়ালা বোধহয় শুনতে পেল না। মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল সীমার। ওর একটাও বেলুন নেই। খেলনা নেই। কেউ ওকে পুতুল কিনে দেয় না। আলমারীতে পুতুল আছে তবু দেয় না।

এবার অমুর ঘরের দিকে ফিরে তাকাল সীমা। তারপর গুটি গুটি পায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টি মেলে আলমারীটার দিকে তাকিয়ে থাকল। অমুর দিকে ফিরে তাকাল একবার। ঘুমোচ্ছে। একটু অবাক হল সীমা। মামণি তো এসময় ঘুমোয় না। আবার আলমারীটার দিকে তাকাল। কতগুলো পুতুলের আভাস। সাহসে ভর করে, এই প্রথম, সীমা পা টিপেটিপে ঘরের ভেতর ঢুকল। ছোট্ট একটা অবদমিত আকাঙ্খা নিয়ে আলমারীটার সামনে দাঁড়াল।

সারি সারি পুতুল। হাতী ঘোরা গরু ব্যাঙ কতকি! লাল টুকটুকে ফ্রক পরা ছোট্ট ছোট্ট ডল্। ওদের শাড়ী পরালে ওরা বউ হয়ে যায়।

মামণি হয়ে যায়। একটা মটর গাড়ী। আর একটা রেল। কাকুর সঙ্গে রেলগাড়ীতে চড়ে এসেছিল। পূউউ-ঝিক্ ঝিক্ করে। ছুঁতে ইচ্ছে করছে। পুতুলগুলোকে ভীষণ নেড়ে চেড়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। আবার অনুর দিকে ফিরে তাকাল সীমা। ঘুমিয়ে আছে। ওতো আর একেবারে নিচ্ছে না। শুধু একটু ছোঁবে। ঢিব ঢিব বুকে আলমারীর কাঁচটার উপর হাত রাখল সীমা। ম্লান একটা তৃপ্তির হাসি ফুটল ঠোঁটে। কিছুক্ষণ কাঁচের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বোধহয় কিছুটা সাহস বাড়ল। একবার আলমারীর দরজা ধরে টান দিল। ক্যাচ্ করে একটা শব্দ হল। খুলে গেল দরজাটা। শব্দে আৎকে উঠল সীমা। বুকটা উত্তেজনায় ওঠা-নামা করছে। তাড়াতাড়ি অনুর দিকে ফিরে তাকাল। অনু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সীমার দিকে। ভয়ে কেঁপে উঠল সীমা। থরথর করে নড়ে উঠল ছোট্ট ঠোঁট দুটো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আল কব্ব না, আমি আল আছব না মামণি।—বলতে বলতে দ্রুতপায়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সমস্ত বুকটা মোচর দিয়ে উঠল অনুর! মুহূর্তের জন্য একটা তীব্র আবেগ ওর সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হল যেন। তাড়াতাড়ি খাটের উপর উঠে বসল ও। কি যেন ভাবল। তারপর আলমারীর কাছে এসে কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, প্রায় নিজের অজান্তেই, একটা ডল্ পুতুলের দিকে হাত বাড়াল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। হাতটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনল অনু। নিজের চেতনায় ফিরে এল। একদিন পুতুল দিলেই রোজ চাইবে। প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। ও ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে এ ঘরে আসবে। এত সচেতনতায় গড়ে তোলা প্রাচীরটায় ফাটল ধরাবে। সে ফাটলের সুযোগ নিয়ে স্বদেশ-আনন্দ-তাপ্তীরা তারপর ওদের সীমানা পেরিয়ে আসবে। কেন স্বেচ্ছায় দুর্বলতার ফাটল সৃষ্টি করে আত্মসমর্পনের ভূমিকা রচনা করবে ও।

দরজায় আবার শব্দ। শব্দের প্রকৃতি নিজেই ঘোষণা করছে তাপ্তী এসেছে। আলমারীর দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে অনু বাইরে এল। ঘরের কোনে নিজেকে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল সীমা। একটা আতঙ্ক যেন জমাট বেঁধে আছে দেওয়ালের

গায়ে। ওর দিকে এগিয়ে গেল অনু। নিজেরই মনে হল, প্রয়োজনের বেশী গভীর করে পরিখা খুঁড়ছে ও। শত্রুর শক্তিকে অনেক বেশী বাড়িয়ে দেখছে বলেই বোধহয়। খেলনা না দিলেও সান্ত্বনা দিতে আপত্তি কি? খেলনাটা বড় বেশী প্রত্যক্ষ। কিছুটা বিজ্ঞাপন। কিন্তু সান্ত্বনা জলের আলপনা। দানের বা গ্রহণের কোন প্রত্যক্ষ স্বাক্ষরের ভয় নেই সেখানে।

অনু নিঃশব্দে গিয়ে সীমার পাশে দাঁড়াল। ওর মাথায় হাত রাখল। একটু চমকে চোখ তুলল সীমা। চোখে আতঙ্ক। ম্লান হাসল অনু। ওর মাথায় হাত বুলাল। তারপর বলল, কাকুর কাছে চেও। নাহয় তাপ্তীদির কাছে।

আতঙ্ক বিস্ময়ে রূপান্তরিত হল। কেমন যেন বোকা-বোকা চাউনিতে অনুর দিকে তাকিয়ে থাকল সীমা। দরজার অধৈর্য্য কড়া এবার উচ্চস্বরে নড়ে উঠল।—মামী!

অনু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। এরপর হয়তো দরজা ভেঙ্গেই ভেতরে ঢুকবে তাপ্তী। ওকে বিশ্বাস নেই।

মামণির কথাগুলো উপলব্ধি করতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল সীমার। মনে মনে ও যখন নিজেকে নিগ্রহের জন্য প্রস্তুত করছে, তখন মামণির কাছ থেকে এমন সাগ্রহ সান্ত্বনা ওকে কেমন যেন বিহ্বল করে দিল। ওর শিশু চেতনায় সব কিছু বিশ্লেষণ করতে পারল না হয়তো, কিন্তু অনুভব করল, কোথায় যেন একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। তাহলে কি মামণির অসুখ সারছে?

খেলনা ও সাহস করে কারো কাছে চাইল না। না তাপ্তী না স্বদেশের কাছে। বরং পুতুলের চেয়েও বেশী খুসী হয়ে খেলল বিড়ালগুলোর সঙ্গে।

ওর এ ছোট্ট পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করল অনু। সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা ভয়ে ভয়ে কাটাল। মেয়েটা স্বদেশকে সব কিছু না বলে ফেলে। স্বদেশ বাড়ী ফিরলেই তো ওর যত গল্প যত বায়না সব স্বদেশের কাছে। কিন্তু না, ও প্রসঙ্গে কিছু বলল না সীমা স্বদেশকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অনু। আর সাবধান হল।

কিন্তু অনুর একটা ছোট ভয় সত্যি সত্যি ফলতে দেখা গেল রাত্রে।

আঁচিয়ে ঘরে এসে একটু অবাক হল স্বদেশ। সীমা বিছানায় নেই। এমন কি ঘরেও না। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল স্বদেশ। পরম নির্লিপ্তভাবে বিড়ালটাকে নিয়ে অনুর বিছানায় শুয়ে আছে সীমা। এ সাহসের উৎস কোথায় জানেনা স্বদেশ। জানান হয়নি বলে। কিন্তু ওর সাহস দেখে অবাক হল। দ্রুতপায়ে ওঘরে গিয়ে চাপা ধমক দিল সীমাকে।

—তোমাকে বলিনি এ ঘরে আসবেনা ? ও ঘরে চল।

সীমা আবদারের সুরে বলল, আমি একানে ছোব।

—কেন আমার সঙ্গে শুতে কি হয়েছে ? রোজ কার সঙ্গে শোও ?

সীমা উঠল না। চোখ পিট পিট করে বলল, ওকানে আমাল ভয় কলে।

ওর হাত ধরে ছোট্ট একটা টান দিল স্বদেশ, ন্যাকামি ; ভয় করে ! বলিনি তোমাকে মার্মণির অসুখ। অসুখ সারলে শোবে।

—অছুকতো ছেলেছে। ভাত কায় তো মামণি।—বেশ বিজ্ঞস্বরে জবাব দিল সীমা।

স্বদেশ এবার মরিয়া হয়ে টেনে তুলল ওকে বিছানার উপর। চাপা একটা ধমক দিল।

সীমারও কেমন যেন একটা জেদ চেপে গেল। হাত টেনে নিয়ে বলল, না, আমি একানে ছোব।

স্বদেশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল এবার। কোন কথা না বলে হিড়হিড় করে টেনে নামাল ওকে বিছানা থেকে। জোর করে এনে শুইয়ে দিল নিজের বিছানায়। তারস্বরে চীৎকার সুরু করল সীমা। যেন কেউ ধরে মেরেছে।

রান্নাঘর থেকে অনু চলে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ?

—মেরেছি।

—কেন ?

—অন্যায় আবদার ধরেছিল।

শ্লেষ দিয়ে একটু হাসল অনু। এনেছই যখন, তখন আর অন্যের উপর

রাগ করে ওকে শাস্তি দিচ্ছ কেন? আবদারটা না হয় মিটিয়েই নিতে। তোমার তো পয়সার অভাব নেই।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনুর দিকে চোখ তুলে তাকাল স্বদেশ। টেনে টেনে বলল, কিন্তু ও এমন জিনিষ চাচ্ছিল যা বাজার থেকে পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আজ ও মামণির সঙ্গে শুতে চাইছিল।

মনে মনে একটু চমকে উঠল অনু। বুঝল সীমার এ আবদারের উৎস কোথায়। স্বদেশের কথার কোন জবাব না দিয়ে সরে গেল অনু। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হোক। সেটাই বাঞ্ছনীয়।

মামণিকে দেখে সীমাও কান্না থামিয়ে ছিল। ভয়ে না ভরসায় কে জানে? মামণির দুপুরের কথা মনে পড়ায় হয়তো এও ভাবতে পারে, মামণি এবার ওকে ডেকে নেবে। কিন্তু না। এ-মামণির চোখমুখ দুপুরের মামণির চোখ মুখের মত না। সেই আগের মামণির মতই। স্বদেশের কোলের কাছে মুখ নিয়ে চোখ বুঝল সীমা।

পরদিন দুপুরে আর এঘরের ধার কাছ দিয়েও এল না সীমা। হয়তো বুঝেছিল কালকের ঘটনাটা ব্যতিক্রমই, নতুন নিয়মের সূত্রপাত নয়। রোজের মতই নিজের মনে বিড়ালগুলো নিয়ে নিজের ঘর সংসার পেতে বসেছিল তাই।

শুয়ে শুয়েই শুনছিল অনু, সীমা বারান্দায় রান্না চাপিয়েছে। খিদেয় বিরক্ত করা বিড়ালদুটোকে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখছে, ঝোলটা ফোটার অপেক্ষায়। একটু বাদে ঝোল নামল। ডালটা চাপিয়ে বিড়ালদুটোকে নিয়ে কলতলায় গেল সীমা ওদের স্নান করিয়ে আনতে। স্নান না করে খেতে নেই, ওতে অসুখ করে যে!

হঠাৎ সীমার একটা আর্ত্ত চীৎকার শোনা গেল। একবারই। তারপর আবার সব চুপচাপ। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসল অনু। এলো-মেলো আঁচলটা কোন রকমে কাঁধের উপর ফেলে দৌড়ে গেল কলতলার দিকে। গিয়ে দেখল কলতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সীমা। কপালের

কোণটা কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। দুহাতে সীমাকে তুলে নিল। ওর হাতের ভেতর এলিয়ে পড়ল সীমা। হতভম্ব হয়ে গেল অনু। কি করবে হঠাৎ ভেবে উঠতে পারল না।

স্বদেশের ঘরে এনে শুইয়ে দিল ওকে। কপালের ক্ষতটা জল দিয়ে ধুয়ে দিল। কিন্তু কিছুতেই রক্ত বন্ধ করতে পারল না।

এ এক নতুন সমস্যা। কাকে দিয়ে ডাক্তার ডাকায়। একা ফেলে নিজেও যেতে পারে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর নিজেই ওকে কোলে করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজায় তালা দিয়ে নিচে নেমে এল। বড় রাস্তার ওপারেই ডাক্তারখানা আছে একটা।

ডাক্তারবাবু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পড়েছিল ?

জবাব দিল অনু, কলতলায়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে অন্তরঙ্গ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার, মেয়ে খুব দুরন্ত বুঝি ?

এ প্রশ্নে সব মা-ই খুসী হয়। দুরন্ত ছেলেমেয়ে মায়েদের এক সমস্যা। কিন্তু গর্বও। ডাক্তার জানতেন এবার কপট বিরক্তিতে ভদ্রমহিলা মেয়ের দুরন্তপনার ইতিহাস বলতে শুরু করবেন। কিন্তু না, অনু কোন জবাব দিলনা। স্থির দৃষ্টিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখতে লাগল।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বৃদ্ধ ডাক্তার বোধহয় বয়সের দাবীতেই বললেন, কিছু মনে ক'রনা মা, আজকালকার মায়েরা কিন্তু বড় কেয়ারলেস্। দুরন্ত ছেলেমেয়েদের একটু চোখে চোখে রাখতে হয়।

সীমা চোখ মেলল একবার। আঘাতটা খুব বড় ছিলনা। সাময়িক আচ্ছন্নতা, বোধহয় আঘাতটা আচমকা বলেই।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু স্নেহের দৃষ্টিতে সীমার দিকে তাকিয়ে আস্তে গাল টিপে ডাকলেন ওকে, দেখি ভাই, তাকাও তো। কিছু হয় নি তোমার। তাকাও। ঐতো মা দাঁড়িয়ে আছে দেখ।

নিজের মনেই একটু চমকে উঠল অনু। কেমন যেন একটা নাম-না-জানা অনুভূতি জড়িয়ে আসতে লাগল সর্বাঙ্গে। ক্ষীণ একটা আবেগ।

সীমা চোখ মেলল। এখনও ঘোর কাটেনি। এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে অনুর দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠল একবার, মামণি।

বৃদ্ধ ডাক্তার সস্নেহে সীমার কপালের উপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে মিষ্টি হেসে বললেন, ভেরী লাভ্‌লি! ছেলেবেলায় পড়া সেই ছড়াটা মনে পড়ছে, এ ধন যার ঘরে নেই তার কিসের জীবন!

বলতে বলতেই অনুর দিকে ফিরে তাকালেন। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে অনু।

ডাক্তার একটুকরো কাগজ নিয়ে পেন বের করতে করতে বললেন, একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, যদি টেম্পারেচার ওঠে তবে দুটো ট্যাবলেট্‌ খাইয়ে দেবেন। হয়তো দরকার হবে না, তবু লিখে দিচ্ছি। ওর নামটা কি বলুন তো?

একটু চমকে উঠল অনু। ডাক্তারের দিকে তাকাল।

—নামটা বলুন।

অস্ফুট স্বরে বলে ফেলল অনু, সীমা।

ডাক্তার লিখতে লিখতেই জিজ্ঞেস করলেন, টাইটেল?

কিছুটা ইতঃস্তত করে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে যেন বলল অনু, গুপ্ত।

বলেই সীমার দিকে এগিয়ে গেল। ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। অজান্তে নিজের কাছ থেকেও কি দূরে সরে আসছে অনু?

সীমাকে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে প্রশ্নটা নানা দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল এবার। প্রশ্নটা পেয়ে বসল ওকে।

সীমা দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আছে অনুর। মাঝে মাঝে মাথাটা ওর কাঁধে ঘষটে বলছে, বেতা, মামণি কোপাল বেতা।

অস্ফুট স্বরে সান্ত্বনা দিচ্ছিল অনু, সেরে যাবে। কিছু হয়নি।

ব্যাথার চেয়ে বেশী অস্বস্তি বোধ করছিল সীমা ছোট্ট ব্যাণ্ডেজটার জন্য। এতদিন পর এই প্রথম মামণির কোলে উঠতে পেরে মনে মনে ভীষণ খুসী হয়েছিল সীমা। ওর ছোট্ট অনুভূতি দিয়ে ও বুঝছিল, মামণির অসুখ এবার সেরে গেছে, মামণি এবার আদর করবে ওকে। চুমু খাবে।

সীমার ছোট নরম আলিঙ্গন তখন উতলা করে তুলেছে অনুকে।

বহুদিন পর পুরোন একটা স্বাদ ফিরে পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পুরোন একটা যন্ত্রণা। কিন্তু সে যন্ত্রণার জন্য তো সম্পূর্ণ দায়ী স্বদেশ। সত্যিই তো, ছোট্ট এই অবোধ মেয়েটার কি দোষ ?

কিন্তু দোষ না থাক, সে যন্ত্রণার উপাদান তো এই মেয়েটাই। সামনে ও আছে বলেই তো স্বদেশ সাহস পাচ্ছে নতুন করে অনুর সঙ্গে আর একবার বোঝাপড়ায় নামতে। ওর যন্ত্রণার ক্ষতে আর একবার প্রলেপ বুলিয়ে দেখবার। অনুকে শান্ত করে নিজের অপরাধের গ্লানি ভুলবার।

নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে তোলে অনু। না, না, অত সহজে অনুকে ভোলান যাবে না। অত সহজে ক্ষমা পাওয়া যাবে না অনুর। নিজের হাতে জ্বালান অনুতাপের আগুণে জ্বলে মরুক স্বদেশ। বিনা অপরাধে একা অনুই বা কেন যন্ত্রণার আগুণে দগ্ধে মরবে ?

থেমে পড়ল অনু। সীমার মুখটা সামনে ঘুরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো ভাল হয়ে গেছ, হেঁটে যেতে পারবে ?

দুহাতে অনুর গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সীমা, না, কোলে।

অনু বুঝল, জোর করে লাভ নেই। রাস্তার ওপর হয়তো কেঁদে কেটে এক বিসদৃশ অবস্থা সৃষ্টি করে বসবে। ওকে কোলে নিয়েই আবার হাঁটতে শুরু করল তাই।

নিজের জয়ে মনে মনে ভীষণ খুসী হল সীমা। প্রশ্রয় পেয়ে পুরোন আবদারী মনটা আবার সজাগ হয়ে উঠল। আচমকা ও অনুর কাঁধের উপর থেকে মাথা তুলে দুহাতে অনুর মুখটা শক্ত করে ধরে ওর ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে বসল। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, এবাল আমাকে হাম দাও।

প্রায় আঁৎকে থেমে পড়ল অনু। রুদ্ধ-মুখ একটা জলস্রোতকে কে যেন আচমকা আলগা করে দিল। নিজেকে হারিয়ে ফেলল ও। বিহ্বল হয়ে গেল। প্রতিটি মুহূর্ত্ত পল অনুপল দিয়ে ভুলতে চেষ্টা করা একটা ছোট মুখ এসে ওর সামনে দাঁড়াল। সীমার মুখের সঙ্গে আস্তে আস্তে মিশে যাবার চেষ্টা করেছে সে মুখটা। নিজেকে আবার শক্ত করে তোলে অনু। না না, তা হয় না। এ স্বার্থপরতা ক্ষমা করবে না খুকু। এ ওর অপরাধ। আহত শিশুর প্রতি শুধু কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে অনু। তার বেশী কিছু নয়। নিছক কর্ত্তব্য। নিরাবেগ নিস্পৃহ কর্ত্তব্য।

সীমা বোধহয় বুঝল আবদারটা একটু বেশীই হয়ে গেছে। অমুর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে তাই দ্বিতীয়বার আর আব্দার করল না চুমুর জন্য। কিন্তু গালের সঙ্গে গালটা লাগিয়েই রাখল। গভীর চিন্তায় মগ্ন অমুর তখন ওসব খেয়াল ছিল না। কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছিল।

তালা দেওয়া দরজার সামনে চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়েছিল তাপ্তী। মামীমাকে কোনদিন একা এভাবে বেরুতে দেখেনি ও। কোথায় যেতে পারে মামীমা। সীমাই বা কোথায় গেল! কতগুলো ছোট ছোট অশুভ চিন্তায় ও ভয় পেল। কিন্তু ভেবে পেল না, এখানে অপেক্ষা করবে, না মামাকে একবার খবরটা দেবে।

একেবারে সিঁড়ির মুখে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল তাপ্তী। এবং একটু পরেই অপ্রত্যাশিত একটা দৃশ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সীমাকে কোলে করে ফিরছে মামীমা। পরম তৃপ্তিতে সীমা গলা জড়িয়ে ধরে গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে আছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাপ্তী।

হঠাৎ সিঁড়ির মুখে এসে মুখ তুলে তাপ্তীকে দেখে থমকে থেমে গেল অমু। তাপ্তীর মুখের বিস্ময়ের উপর দিয়ে হালকা একটা খুসীর হাওয়া বয়ে গেল এবার। তৃপ্তির ছাপ ফুটল চোখেমুখে। আবেগে নিজেকে বেশ কিছুটা উত্তেজিত মনে হল। একটু মিষ্টি হেসে হঠাৎ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে বলে গেল ও, একটু আসছি।

সেই মুহূর্তেই ব্যাপারটি বুঝল অমু। কোন্ অনুমান ওকে খুসীতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, বুঝল। কিন্তু দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে তাপ্তীকে ডাকতে এগিয়ে দেখল সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে গেছে ও।

বিরক্তির সঙ্গে সীমাকে ঠেলে কোল থেকে নামিয়ে দিল অমু। ওর জন্যই তাপ্তী ওকে ভুল বুঝে গেল। জানে অমু এ সংবাদ বাতাসের আগে গিয়ে আনন্দ আর স্বদেশের কানে পৌছবে। ওরা মনে মনে তৃপ্তির হাসি হাসবে—গোপনে তাহলে সীমাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় অমু!

ভাবতেও একটা অসহ্য রাগে রি-রি করে উঠল মন। সীমাকে দরজার মুখে রেখেই তালা খুলে ভেতরে চলে গেল অমু।

হতভম্ব সীমার চোখ জলে ভরে এল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও দরজার মুখে।

বাতাসের আগে না হলেও আনন্দকে খুসির খবরটা তখনি পৌছে দিয়েছিল তাপ্তী। আনন্দ খুসীতে সোজা হয়ে উঠে বসেছিল। তাপ্তীকে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল স্বদেশের অফিসে।

—কেমন, আমার কথাটাই ফলল কিনা দেখলে তো। হাজার হলেও মেয়েরা মায়ের জাত।

কি যেন চিন্তা করতে করতে বলল স্বদেশ, এখনই তোমাদের মত এত উচ্ছসিত হতে পারছি না, তবু তোমাদের ধারণা সত্যি হলে সেটা আনন্দের কথা।

বিকেলে বাড়ী ফেরার সময় অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে একটা খেলনা কিনে আনল স্বদেশ। সীমার প্রথম দিনের সেই খেলনা পেয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়া করুণ চাউনিটা আজো ভুলতে পারেনি ও। কিন্তু এতদিন ঠিক সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি।

খেলনা দেখে খুসীতে ঝিকমিক করে উঠল সীমার চোখদুটো। খেলনাটায় চাবি দিয়ে সীমার মুখের সামনে তুলে ধরল স্বদেশ। জলতরঙ্গের বাজনা বাজিয়ে, ঝুলে থাকা প্লাষ্টিকের ফুলঝুরিগুলো ডানা মেলে ঘুরতে শুরু করল। খিলখিল করে হেসে উঠল সীমা।

—আমাল জন্য এনেছো ?

হেসে মাথা নাড়ল স্বদেশ।

অপলক দৃষ্টিতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল অনু। যা সন্দেহ করছিল তাই। সংবাদটা তাহলে যথাস্থানে যথাসময়েই পৌছে-ছিল। খেলনাটাকে স্বদেশের বিজয় পতাকা বলে মনে হল অনুর। স্বদেশ খেলনা কিনে এনেছে। আর আনন্দ তাপ্তী ওরা বোধহয় কিনছে এতক্ষণে। রাগে বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা রি-রি করে উঠল ওর। এত সহজ! আজীবন বঞ্চিত নিগৃহীতি একটা মনকে ভুলানো এত সহজ!

স্বদেশের একেবারে গা ঘেষে এসে দাঁড়াল অনু। কঠিনস্বরে জিজ্ঞেস করল, কোন আশ্রমের খোঁজ পেলে?—ওর আসাটা টের না পাওয়ায় একটু চমকে উঠল স্বদেশ। তারপর উঠে জামাটা ছাড়তে ছাড়তে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া স্বরে বলল, না পাইনি এখনও, খোঁজ খবর করছি।

দাঁত দিয়ে একবার ঠোঁট কামড়াল অনু।—কেন, কলকাতায় কি আশ্রমের অভাব? আর কত শাস্তি তুমি আমাকে দিতে চাও বলতে পার?

আলনায় জামাটা রাখতে রাখতে অনুর দিকে ফিরে বলল স্বদেশ, তুমি নিজেই নিজেকে শাস্তি দিচ্ছ অনু।

চাপা চীৎকার করে উঠল অনু, থাম। নিজের অপরাধ মিষ্টি কথায় ঢাকবার চেষ্টা কর না। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে!

কোন উত্তর দিল না স্বদেশ। তোয়ালেটা নিয়ে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

অনু ঘুরে দাঁড়াল।—কোন জবাব দিচ্ছ না কেন?

সংযতস্বরে বলল স্বদেশ, নিজেকে সংযত কর অনু। কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

অনু কোন উত্তর দেবার আগেই দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হল। স্বদেশ এগিয়ে গেল দরজার দিকে। অনু গমকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতেই শুনতে পেল আনন্দ এসেছে। ও আজ আসবে জানত অনু। ফাঁদে পড়া শিকারকে দেখতে আসবে আজ ওরা সবাই।

আনন্দ দূর থেকেই খেলনা নিয়ে বসে থাকা সীমাকে দেখে খুসী হল। ঘরে ঢুকে মুঠ করা হাতটা সামনে এগিয়ে ধরে বলল, কি এনেছি বলতো?

সীমা উঠে ওর পাশে দাঁড়াল।—কি?

—তুমি কি খেতে যেন ভীষণ ভালবাস?

সীমা একটু হাসল।—তকলেত?

আনন্দ ওকে জরিয়ে ধরল।—বাঃ, ঠিক ধরে ফেলেছ তো।

তারপর চকলেটের ঠোঙাটা খুলে ওর সামনে ধরল। সীমা নিঃসঙ্কোচে দুটো তুলে মুখে দিয়ে চুষতে লাগল।

আনন্দ ওর গালে টোকা দিয়ে বলল, আচ্ছা। তুমি আর কি কি ভালবাস বল তো?

সীমা একটু চিন্তিত হল, আল··· আল··· ?

একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আনন্দ, আচ্ছা সীমা, তুমি আর কাকে কাকে ভালবাস বল তো ?

সীমা এবার বিনা চিন্তায় জবাব দিয়ে দিল, তোমাকে, কাকুকে আল মামণিকে।

—আচ্ছা, তোমাকে সবচেয়ে ভালবাসে কে ?

এবার একটু চিন্তা করল সীমা। তারপর চকলেট খেতে খেতে অবলীলাক্রমে বলে দিল, মামণি।

জানলার কাছ দিয়ে যেতে যেতে থেমে গেল অনু। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল।

আনন্দ উৎসাহিত হয়ে ওকে কোলের ভেতর টেনে নিল। খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল, তাই নাকি ? কি করে বুঝলে ?

সীমা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেনে জবাব দিল, আমাকে আদল কলে বলে ! আমাকে লোজ ছকালে হাম দেয়।

অনুর বিরক্তিটা এবার রাগে রূপান্তরিত হয়। নিঃশব্দে রান্নাঘরে ফিরে যায় অনু।

স্বদেশ মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল। তোয়ালেটা রেখে আনন্দর সামনে এসে বসল।

সীমা ততক্ষণে একটা বিড়ালের সঙ্গে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে ঘরের ভেতর। ওকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে স্বদেশকে জিজ্ঞেস করল আনন্দ, কেমন বুঝছ ?

দরজার দিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল স্বদেশ, ভাল নয়। তোমরা যা ভেবেছ বোধহয় তা নয়।

একটু অবাক হল আনন্দ, কিন্তু সীমা যে বলছিল বৌদি ওকে খুব আদর করে। রোজ সকালে চুমু খায় !

বিড়ালটার পিছে পিছে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সীমা।

স্বদেশ যেন আকাশ থেকে পড়ে, সীমা বলেছে ?

—হ্যাঁ, এইমাত্র বলল।

একটু চিন্তিত হল স্বদেশ—কি জানি! আমার তো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনু রান্নাঘরে চা করতে করতে সীমার কথাই ভাবছিল। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল ওর। আনন্দ ঠিক বিশ্বাস করেছে ওর মিথ্যে কথাটা। হয়তো সোৎসাহে সংবাদটা এখন স্বদেশকে পরিবেশন করছে আনন্দ। শিকার জালে পা দিয়েছে দেখে দুজনের চোখেই খুসীর আমেজ দেখা দিয়েছে। অথচ টের পাচ্ছেনা ওরা একথা কত বড় মিথ্যে।

খুকুর কথা ভোলেনি অনু। ভুলতে পারবে না। স্বদেশকে ক্ষমা করেনি ও। কোনদিনই পারবে না। অথচ এক নিঃশ্বাসে একটা মিথ্যে কথা বলে এ সমস্ত সত্যিগুলিকে উড়িয়ে দিল মেয়েটা!

বিড়ালের পিছে ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরের সামনে এসে পড়ল সীমা। বিড়ালটা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। হঠাৎ খেয়াল হতে থেমে পড়ল সীমা। অনু গম্ভীর স্বরে ডাকল, এই শোন।

ফিরে তাকাল সীমা। অনুর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝল অন্যায় করে ফেলেছে। চোখ পিটপিট করে বলল, আল এই ঘলে আছব না।

ওর সামনে এগিয়ে এল অনু। নির্মমভাবে সোজা জিজ্ঞেস করে বসল, তোকে আমি আদর করি? চুমু খাই?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল সীমা। চোখ ছলছল করে এল।

ধমক দিল অনু, কেন মিথ্যে কথা বললি? আর বলবি কোনদিন?

মাথা নাড়ল সীমা, না।

—যা, ওদের বলে আয় যে মিথ্যে কথা বলেছিলি।—সামনে ঠেলে দেয় ওকে অনু, যা।

ধাক্কা খেয়ে কিছুট সরে যায় সীমা। করুণ দুটো চোখ তুলে একবার অনুর দিকে তাকায়। তারপর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় স্বদেশের ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে স্বদেশের কোল ঘেসে গিয়ে দাঁড়ায় সীমা। কয়েকবার আনন্দের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকায়। তারপর কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে, মামণি আমাকে ভালবাছে না। হাম দেয় না।

ওদের আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। দুজনেই ফিরে তাকায় সীমার দিকে। সীমার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখ জলে ভরে এসেছে।

আনন্দ ওকে কোলের কাছে টেনে নেয়। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কে বলেছে ভালবাসে না! বাসে।

এবার কেঁদে ফেলে সীমা।—মামণি বলতে বলেছে। কেউ ভালবাছে না আমাকে। কেউ ভালবাছে না।

সমস্ত শরীরটা রাগে রি-রি করে উঠল স্বদেশের। এত নির্মম, এত নিষ্ঠুর অনু! আনন্দের সামনে স্বদেশকে কি এভাবে অপদস্থ না করলেই চলছিল না ওর! শুধু রাগ নয়, অনুর উপর রীতিমত ঘৃণা হল এবার স্বদেশের।

শান্ত পদক্ষেপে নির্লিপ্ত মুখে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল অনু। স্বদেশ সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি যে ওকে ভালবাস না, সে কথাটা কি ওকে জোর করে বুঝিয়ে না দিলেই চলছিল না?

টেবিলে চা রাখতে রাখতে শান্তস্বরে জবাব দিল অনু, সত্যি কথাটা ওর জানা প্রয়োজন।

স্বদেশ উঠে দাঁড়াল। দৃঢ়স্বরে বলল, নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকা উচিত। ভালই করেছ। সত্যি কথাটা আমারও জানা প্রয়োজন ছিল।

সীমাকে আনন্দের কোল থেকে টেনে নামাল স্বদেশ। সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, যা, জুতো পড়ে আয়!

আনন্দ হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল সীমাকে। স্বদেশ বাধা দিল আনন্দকে।—তুমি সব কথা বুঝবে না ডাক্তার। তুমি এর ভেতর এস না।

আনন্দ আঘাত পেল। আস্তে হাত সরিয়ে নিল।

সীমার কান্না থেমে গিয়েছিল। ওদের সব কথার অর্থ ও বোঝেনি। কিন্তু বোধহয় ওর শিশু অনুভূতিতে উপলব্ধি করতে পারছিল যে ও এখানে অবাঞ্ছিত। অকাম্য। ছোট্ট একটা অভিমান, ছোট্ট একটা জেদের ছায়া ফুটে উঠছিল ওর ডাগর চোখ দুটোয়। বড় বড় দৃষ্টি মেলে সবার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল ও।

ধমক দিয়ে সামনে ঠেলে দিল ওকে স্বদেশ, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, জুতো পড়ে আয়!

সীমা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। টেবিলের কোণ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অনু। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্বদেশ। অনুও পিছে পিছে গিয়ে দরজার কাছে স্বদেশের পাশে দাঁড়াল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওকে ?

ঘুরে দাঁড়াল স্বদেশ। বহুদিন পর আজ ওর ধৈর্য্যের বাঁধ আলগা হয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তা শুনে তোমার কোন লাভ আছে ? তোমার নৃসংশতার আরো যদি কিছু বাকী থাকে তবে সেটুকু সেরে নিতে পার, আমি অপেক্ষা করছি।

প্রচণ্ড আঘাতে চোখ তুলে তাকাল অনু, কি বললে ?

—যেটুকু শুনেছ, তাই।

একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠল অনুর চোখেমুখে। তীক্ষ্ণ একটা বিক্রপের ছায়া। শ্লেষ দিয়ে একটু হাসল অনু। বলল, নৃসংশতা! কিন্তু ওতে তো তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না আমি।

—মানে ?

—আমার নৃসংশতা একটা শিশুকে হয়তো খানিকটা স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু তোমার নৃসংশতা একটা মেয়ের জীবন ছিবরে করে দিয়েছে। সন্তানকে হত্যা করেছে, আর একটি সন্তানকে ভ্রূণ অবস্থায় ধ্বংস করেছে।

স্বদেশের তীব্র ধমকে মাঝপথে থেমে গেল অনু।—এতদিন সমস্ত মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আজ এই প্রথম ও শেষবার তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এ প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে কোনদিন যেন এভাবে তোলা না হয়।

—কেন, অপ্রিয় সত্য বলে ?

—না, মিথ্যে বলে। ও সমস্তটাই একটা দুর্ঘটনা।

আবারও শ্লেষ দিয়ে হাসল অনু, তাহলে সেটা শুধু আমার ক্ষেত্রেই। ও দুর্ঘটনা তোমাকে মহান করেছে, ত্যাগী প্রমাণ করেছে, জননেতা করেছে।

স্বদেশ এর কোন জবাব দিল না। আত্মসংযমের চেষ্টায় চোয়ালের হাড় দুটো দুতিনবার শক্ত হয়ে উঠল মাত্র। সীমাকে তাগাদা দেবার জন্য এগিয়ে গেল তারপর।

এতক্ষণ ঘরে বসে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল আনন্দ। সঙ্কোচবোধ করছিল। যদিও এ পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ও, তবু এই পারিবারিক

দ্বন্দ্বে নিজেকে অনধিকার প্রবেশকারী বলে মনে হচ্ছিল। যেন গোপনে লুকিয়ে শুনছে সব। মনে মনে নিবিড় একটা সহানুভূতিও অনুভব করছিল, দু'জনের জন্য। সীমাকে মানতে না পারা বৌদির পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। সীমার প্রতি বিরূপ ব্যবহারে ক্ষুন্ন হওয়া স্বদেশের পক্ষেও অন্যায় নয়। অথচ এই পারিবারিক দ্বন্দ্বে নেবার মত কোন ভূমিকা নেই আনন্দর। একবার তো চেষ্টা করে দেখল, হিতে বিপরীত হয়ে বসল।

এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে উঠে দাঁড়াল আনন্দ। দরজার কাছে এসে মাথা নিচু করে অনুকে বলল, বৌদি চলি।

অস্ফুট স্বরে বলল অনু, এস।

এগিয়ে যেতে গিয়েও থামল আনন্দ। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, এর সমস্ত দায়িত্ব আমার বৌদি, সব দোষ আমার। আমিই জোর করে মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়েছিলাম স্বদেশদার ঘাড়ে। মেয়েটার ওপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল বলে ভেবেছিলাম, সবাই মিলে একটা ব্যবস্থা না করতে পারা পর্য্যন্ত একটা বিশ্বস্ত জায়গায় থাক ও। স্বদেশদা স্বেচ্ছায় ওকে আনেনি। আমাকে ক্ষমা কর।

বলেই দ্রুত এগিয়ে গেল আনন্দ দরজার দিকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল বাইরে থেকে।

বারান্দার কোণে যেখানে জুতো থাকে সেখানে গিয়ে দেখল স্বদেশ, সীমার ছোট্ট লাল জুতো জোড়া পড়ে আছে, কিন্তু সীমা নেই। নিজের ঘরে এসে দেখল সেখানেও নেই।

দ্রুত পায়ে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাগুলোই খুঁজে দেখল। কিন্তু পাওয়া গেল না সীমাকে। গলা চড়িয়ে ডাকল ক'বার, সী—মা—।

কোন সাড়া নেই। অনুর ভেতরও ছোট্ট একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। হঠাৎ মনে পড়ল ওর, আনন্দ আসার পর দরজাটা খোলাই ছিল। তবে কি বেরিয়ে গেল বাইরে?

স্বদেশ গিয়ে চুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। অনু দেখে অবাক হল, উঠবার নাম করছে না যে লোকটা! অগত্যা নিজেই এগিয়ে গেল। উত্তেজনা গোপন করে বলল, কোথায় গেল খুঁজে দেখতে হবে না?

শান্ত দৃপ্ত স্বরে জবাব দিল স্বদেশ, না।

—না মানে ?

—বিদায় করতেই চেয়েছিলাম, নিজে থেকে বিদায় নিয়ে বাঁচিয়েছে আমাকে।

এবার একটা চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল অনুর স্বরে, তাহলে তুমি সত্যিই খোঁজ করবে না ?

কোন জবাব দিল না স্বদেশ। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হাতটা আড়াআড়ি চোখের উপর রেখে চোখ বুঝল ও।

দ্রুতপায়ে ঝুল বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল অনু। নিচের দিকে তাকিয়ে ডাকল, ঠাকুরপো।

আনন্দ তখনও ফুটপাথ ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়েনি। ফিরে ঘাড় তুলে তাকাল।

অনুনয়ের সুরে বলল অনু, শিগগির একবার ওপরে এস ভাই।

অনুর এ পরিবর্ত্তনে আনন্দ বুঝল কোন একটা বিপদ ঘটে গেছে নিশ্চয়ই। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে এল আনন্দ। এসে সব শুনল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল স্বদেশকে, তুমি বসে পড়লে যে, খোঁজ করবে না ?

কোন জবাব দিল না স্বদেশ। আনন্দ আবার তাগাদা দিল, হয়তো এখনও বেশীদূর যেতে পারেনি স্বদেশদা, তাড়াতাড়ি চল।

স্বদেশ এবার কিছুটা উত্তেজিতভাবে উঠে বসল। কাঁপা গলায় বলল, আমি আর এসব ঝামেলা পোয়াতে পারছি না ডাক্তার, তোমরা আমাকে মুক্তি দাও, একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

স্বদেশ উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সবই বুঝল আনন্দ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুর দিকে তাকাল। অনুর উৎকণ্ঠিত স্নিগ্ধ চোখের দিকে। অনেকদিন পর অনুকে দেখে ছোট্ট একটা তৃপ্তি বোধ করল আনন্দ।

বলল, আমি বেরিয়ে পড়ছি বৌদি। দেখি, খুঁজে দেখি।

কিন্তু সীমাকে খুঁজে পেল না আনন্দ।

ঘণ্টা তিন চার পর ক্লান্ত অসহায় পদক্ষেপে আস্তে আস্তে এসে অনুর

সামনে দাঁড়াল। একটা অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গীতে বলল, পেলাম না। পুলিশে ডাইরি করে এসেছি।

আজকের দুপুরটা অনুর অনুতপ্ত দুপুর। অন্য দিন থাকে শুধু নিঃসঙ্গতা। আজ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্য এক যন্ত্রণা। সীমার নৈকট্য না পেলেও এ কদিন অনুর দুপুরগুলো মেয়েটার উপস্থিতিতে ভরাট হয়েছিল। ছিল চাঞ্চল্য। কিন্তু আজ যেন বিরাট একটা ক্লান্তি নিয়ে দুপুরটা গা এলিয়ে পড়ে আছে সামনের বাড়ীর ছাদের আলসের কোণে। গাছের নিস্পন্দ পাতাল ঝোপে। প্রাসাদ মিছিলের ছায়া এড়ান বোবা গলির বুকে।

বার বার মনে পড়ছে সীমার কথা। কথা আর মুখ। আর তীব্র একটা অনুতাপ এসে ওকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলছে। মেয়েটার কি দোষ ছিল? স্বদেশকে শাস্তি দিতে গিয়ে, এ-কাকে শাস্তি দিয়ে বসল অনু? নিজের বঞ্চিত জীবনের শোধ তুলতে ওকে কেন এতবড় একটা বঞ্চনার ভেতর ঠেলে দিল? খুকুর এ সর্বনাশ কেউ করলে তাকে কি ক্ষমা করত অনু? ঘৃণা করত না তাকে? ধিক্কার দিত না?

অস্থিরভাবে বিছানার উপর উঠে বসে অনু। বেঁচে আছে তো মেয়েটা? যদি সেই লোকগুলোর খপ্পরে পড়ে? যারা শিশুদের বিকলাঙ্গ করে ব্যবসা করে। ওর তুলতুলে হাতগুলো ভেঙ্গে দেবে তারা? অন্ধ করে দেবে?

নিজেকে ঝাকি দিয়ে সজাগ করে তুলল আবার। না না, এসব কথা ভাববে না ও। ওর কি দোষ? ওতো তাড়ায়নি মেয়েটাকে। যে আদর করে নিয়ে এসেছিল সেই তাড়িয়েছে। তাহলে এত ভাবছে কেন অনু? নিজেকে এত অপরাধী মনে করছে কেন? বরং যেটুকু অনুসন্ধান করানোর সেতো ও-ই করিয়েছে। যে আদর করে কুড়িয়ে এনেছিল সে তো কিছুই করে নি!

সোজা গিয়ে রেডিওটা খুলে দিল অনু। যত দূর সম্ভব চড়া করে দিল স্বর। প্রায় গর্জন করে উঠল একটা বিদেশী অর্কেস্ট্রা। নিঝুম

দুপুরটাকে খান খান করে দিল। একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল অনু। একটা হাসির গল্প ছিল ম্যাগাজিনটায়। কোন পাতায় যেন?

সেদিন গোটা দিন, সারা রাত্রি, পরদিন সকাল-দুপুর, একই অস্বস্তিতে কাটল। একই অন্তর্দ্বন্দ্বের দাহে দগ্ধ হল মুহূর্তগুলো। বিকেলের দিকে পুলিশের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল সীমা।

কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে অবাক হল অনু। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সীমা। বিরাট একটা ঝড় পেরিয়ে আসা রুক্ষ চেহারা। চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা বিহ্বল ভাব। অনুর চোখে চোখ পড়তেই থরথর কেঁপে উঠল সীমার ঠোঁট দুটো।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন তো, এই মেয়েটিই আপনা-দের কিনা।

কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়ল অনু, হ্যাঁ।—তারপর সীমার দিকে তাকিয়ে ডাকল, সীমা!

বাঁধ ভাঙ্গা কান্নায় এবার ডুকরে কেঁদে উঠল সীমা। ছুটে এসে অনুকে জড়িয়ে ধরল।—আমি আল কববনা মামণি; আল লাছতায় একা দাব না।

অনুর চোখ দুটো জলে ভরে এল। আবেগে গলার কাছটা আটকে আসতে লাগল।

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক এবার অনুযোগ করলেন।—বাড়ীতে ছেলে পুলে থাকলে মা-বাবার একটু এ্যালার্ট থাকতে হয়। কি বিরাট সর্বনাশের মুখ থেকে ওকে উদ্ধার করেছি শুনলে শিউরে উঠবেন। খুব অল্পের জন্য মেয়ে ফিরে পেয়েছেন।

কোন জবাব দিল না অনু। মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল।

অফিসে বসেই তাপ্তীর কাছ থেকে ফোনে জেনেছিল স্বদেশ, সীমাকে পাওয়া গেছে। তাপ্তী নিজে দেখে এসেছে। সংবাদটা এতবড় একটা সংবাদ হওয়া সত্ত্বেও সে রকম নাড়া দিল না স্বদেশকে। স্বদেশ নিজেও এতে

একটু অবাক হয়েছিল। বিরাট একটা দুশ্চিন্তার ভেতরও এ দুদিন একটা সাময়িক মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল স্বদেশ। আবার নতুন করে যেন সমস্যাটা মাথা চাড়া দিল। মনে মনে স্থির সিদ্ধান্তে এল স্বদেশ, এবার মেয়েটাকে পার করতে হবে। সীমা বা অনুর উত্তেজনার কোন কারণ না ঘটে এরকম কোন উপায় বেছে নিয়ে।

ঘটনাটা ভাল করে শুনে নেবার জন্য অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে তাপ্তীদের বাড়ী গেল স্বদেশ।

তাপ্তী মেঝেতে একরাশ খবরের কাগজ, লালকালি আর দাঁতন বিছিয়ে নিয়ে পোষ্টার লিখছিল। পাশে বসে পরান হাত পা নেড়ে সারস্বরে পুরীর বর্ণনা দিচ্ছিল। তাপ্তী বেশ উপভোগ করছিল ওর গল্পগুলো।

একসময় পোষ্টার লিখতে লিখতেই জিজ্ঞেস করল তাপ্তী, স্নান করিসনি সমুদ্রে ?

পরান একটু লাজুক হেসে বলল, একদিন একটু জল তুলে মাথায় নিয়েছি। সাহস পেলাম না চান করতে।

একটু হাসল তাপ্তী, কেন, ভেসে গেলে বউ অনাথ হয়ে যাবে বলে ?

পরাণ লজ্জায় মাথা চুলকোয়, কিযে বল দিদিমণি।

তাপ্তী যেন কি বলতে যাচ্ছিল, স্বদেশকে ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। বলল, তুমি বাড়ী যাওনি ?

চেয়ারে বসে ক্লান্ত স্বরে বলল স্বদেশ, যাব। তার আগে তোর কাছে সব শুনতে এলাম। কি রকম বুঝলি ?

পরাণের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল তাপ্তী, ঠিক বুঝলাম না। আচ্ছা, তুমি একটু এ ঘরে এস মামা।

তাপ্তীর সঙ্গে পাশের ঘরে গেল স্বদেশ। মোটামুটি বিবরণটা জেনে নিল। তার বেশী কিছু তাপ্তীও বলতে পারল না। তারপর মামাকে বসতে বলে রান্নাঘরে গেল চা করতে।

স্বদেশ ঘরে ফিরে এসে পরাণকে জিজ্ঞেস করল, পুরী থেকে কবে ফিরলে পরাণ ?

—কাল মামাবাবু। আপনার কি শরীরটা খারাপ ?

একটু ম্লান হাসল স্বদেশ, শরীরের আর দোষ কি? এখন এখানে থাকবে তো কদিন?

পরাণ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, না মামাবাবু, কালকেই চলে যাব। ওখানে ওঁকে বাড়ীতে একা রেখে এসেছি। বাড়ীতে তো জনপ্রাণী বলতে আর কেউ নেই।

পরের দিকে কেমন যেন গলাটা ভারী হয়ে এল পরাণের। মনে পড়ল স্বদেশের, না জেনে ওর একটা দুর্বল জায়গায় নাড়া দিয়ে ফেলেছে ও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা নতুন চিন্তা খেলে যায় স্বদেশের মাথায়। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে পরাণের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটু সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে, ঘরে ছেলেপেলে নেই বলে তোমাদের খুব কষ্ট, না পরাণ?

পরাণ করুণ দৃষ্টি তুলে বলল, আমার কথা ভাবিনা মামাবাবু, জিরাত কৃষি এটা ওটা নিয়ে সময় কেটে যায়। কিন্তু মামাবাবু, ওঁর কথা ভাবলেই দুঃখ হয়।

স্বদেশ হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে। প্রায় ফিসফিস করে বলে, একটা মেয়ে নেবে তুমি পরাণ? নিজের মেয়ের মতই মানুষ করবে।

অবাক হয় পরাণ।—মেয়ে! কে দেবে?

—আমি।

—আপনি? কার মেয়ে?

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে স্বদেশের স্বর। যেন অনেক দূর থেকে কেউ কথা বলছে।

—তা জানিনা। কিন্তু ভারী সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। ফুলের মত নরম।

এরপর হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে স্বদেশ। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তাপ্তীর কাছে সব শুনে নিও। যদি মত হয় আমার সঙ্গে দেখা কর।

আগে থেকে জানত বলেই বাড়ী ফিরে সীমাকে দেখে অবাক হল না

স্বদেশ। নির্লিপ্তভাবে এগিয়ে গিয়ে জামা কাপড় বদলে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

অনু বুঝল, সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে এখন স্বদেশ। এ হাতিয়ার কাল নিজেই এগিয়ে দিয়েছে অনু স্বদেশের হাতে। সীমা হারিয়ে যাওয়ায় ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে। উদ্বেগে উদ্বেল হয়ে উঠে।

একটু বাদেই একবারে দুটো করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে আনন্দ এসে হাজির।

সশব্দে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল আনন্দ। দরজার মুখে অনুকে দেখে খুসীতে প্রায় চীৎকার করে উঠল, থানা থেকে খবর পেলাম, সীমাকে নাকি পাওয়া গিয়েছে ?

মাথা নেড়ে সায় দিল অনু।

এবার স্বদেশের ঘরে এসে ঢুকল আনন্দ।

জানালার শিক ধরে নিচে রাস্তায় দিকে তাকিয়ে বসেছিল সীমা। বিহ্বল ভাবটা তখনও পুরো কাটেনি ওর। আনন্দ সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নিল ওকে। দুহাতে উঁচু করে ধরে মাথাটা ওর পেটে ঘষটে বলল, কিরে ফাজিল মেয়ে, আর একা যাবি রাস্তায় ?

দরজার ফাঁক দিয়ে আনন্দকে দেখছিল অনু। এবারও বুঝল ও, সীমাকে নিয়ে এত উচ্ছল হয়ে উঠবার দ্বিধাহীন সাহস আনন্দ কোত্থেকে পেয়েছে। কিন্তু আজ আর অন্যদিনের মত এতে বিদ্বেষ অনুভব করলনা অনু। নিজেকে পরাজিত মনে করে উত্তেজিত হল না। কারণ এ দুদিন শুধু সীমার কথাই ভাবেনি ও, নতুন করে নিজের আর স্বদেশের কথাও ভেবেছে। তাপ্তী ভাবিয়েছে বলে।

রান্নাঘরের দিকে চলে গেল অনু।

এতদিন, বোধহয় বয়সের ব্যাবধানটা মনে রেখে, তাপ্তী সব জানা সত্বেও ওদের এই একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যায় কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। মামার জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে সহানুভূতি অনুভব করেছে। মেয়ের মন নিয়ে মামীমার কথাও বুঝতে চেষ্টা করেছে। আর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে, তর্ক করেছে শুধু মার সঙ্গে।

কিন্তু সীমা হারিয়ে গিয়ে ওকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল, উত্তেজিত

করেছিল বলেই বোধহয়, শেষ পর্যন্ত তাপ্তী নিজের অধিকারে এগিয়ে এসেছিল। সংযত ভাবে, এই প্রথম, মামীমার সঙ্গে আলোচনা করেছিল এ প্রসঙ্গ নিয়ে। বুঝিয়েছিল, সব দেশেই সব যুগেই এমন কিছু ছেলেমেয়ে হঠাৎ জন্মগ্রহণ করে বসে যারা শুধু পুত্র বা কন্যা নয়, স্বামী বা স্ত্রী নয়, পিতা বা মাতা নয়—তার চেয়ে অনেক বড় পরিচয় নিয়ে জন্মায় তারা। সব চেয়ে বড় দাবী থাকে তাদের উপর দেশের। পৃথিবীর। তাদের মৃত্যুর পর ইতিহাস তাই তাদের কথাই মনে রাখে। তাদের জন্যই গর্ব করে। আর সব নাম ঝড়া পাতার মত উড়ে মিলিয়ে যায়। ছোট স্বার্থের গণ্ডীবদ্ধ দাবী নিয়ে তাদের বিচার করে আমরা নিজেদেরই কষ্ট বাড়াই, তাদেরও যন্ত্রণা দেই। তারা যদি আমাদের গর্বই তাহলে পারিবারিক সামাজিক গণ্ডীতে তাদের সীমাবদ্ধতা কেন আমরা মেনে নেব না? এটুকু স্বার্থত্যাগ কেন করব না আমরা?

সেই মুহূর্তে কথাগুলো মেনে নিতে পারেনি অনু। বরং বক্তৃতা বলে মনে হয়েছিল তাপ্তীর কথা। তাপ্তী ওর অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

কিন্তু তারপর নিঃসঙ্গ মুহূর্তে নতুন করে ভাবতে বসেছিল অনু। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার চেষ্টা করেছিল সমস্যাটাকে। এবং শেষ পর্য্যন্ত মনে হয়েছিল, তাপ্তীর এত যুক্তি সত্বেও স্বদেশ নির্দোষ নয়, কিন্তু ওর প্রাপ্য শাস্তির অনেক বেশী ওকে এর ভেতরই দেওয়া হয়েছে বোধহয়।

স্বদেশ নিজেও আজ জীবন থেকে বঞ্চিত। অনুতপ্ত। অনুশোচনায় দগ্ধ। ওকে আর নতুন করে আঘাত দেবে না। সাড়ম্বরে গ্রহণও করবে না। সেটা সময় সাপেক্ষ। সীমা এলে সহজ করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করবে আবার। আর এর ভেতর নতুন করে কেউ যদি আসে? সে আসুক। ওর নিজের হয়ে কেউ আসুক না, ক্ষতি কি?

ফুটন্ত কেটলিটার সামনে বসে এসব কথাই ভাবছিল অনু। উদ্গত বাষ্পগুলোর সঙ্গে এলোমেলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল চিন্তাগুলো। কিন্তু শেষ চিন্তাটা, নতুন কেউ আসার চিন্তা, ওকে মনে মনে লজ্জিত করল। খুসী করল। উতলা করল।

সীমার সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছিল আনন্দ। স্বদেশ ঘরে ঢুকলে সীমাকে ছেড়ে হাসতে হাসতে স্বদেশের কাছে এগিয়ে এল।—হারিয়ে গিয়ে মেয়েটা কেমন ধীর স্থির হয়ে ফিরেছে দেখেছ?

স্বদেশ জামা গায় দিতে দিতে গম্ভীর ভাবে বলল, অশান্তির যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু বোধহয় পুরিয়ে দিতে এসেছে।

উচ্ছল হাসিটা বন্ধ হল আনন্দর। স্বদেশ ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল। আনন্দ এসে পাশের চেয়ারে বসল। স্বদেশের চোখে মুখে একটা ক্লান্তির আর চিন্তার ছাপ।

স্বদেশ বলল, ওর একটা ব্যবস্থা করে এলাম।

আনন্দ একটু অবাক হল, কি ব্যবস্থা?

—এক জন লোক ওকে নিতে রাজী হয়েছে।

—কে?

—আমাদের চেনা লোক।

আনন্দ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আর দুটোদিন দেখলে হত না? বৌদির কোন পরিবর্ত্তনই কি চোখে পড়েনি তোমার?

একটা চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলল স্বদেশ, ওটা পরিবর্ত্তন নয় আনন্দ। রাস্তার একটা গরু ছাগলকে গাড়ী চাপা পড়তে দেখলে যেটুকু চাঞ্চল্য অনুভব করি আমরা, তাই। তার বেশী কিছু নয়। লক্ষ্য করে দেখেছ, মেয়েটা ফেরার পরই চোখমুখের ভাব আবার যেইকে সেই!

আনন্দ কোন উত্তর দিল না।

স্বদেশও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, লোকটা বিশ্বাসী। নিঃসন্তান। ও ভালই থাকবে।

কিছুটা অভিমানের সঙ্গে বলল আনন্দ, ভাল হয়তো থাকবে না, তবে বেঁচে থাকবে।

স্বদেশ সামান্য উত্তেজিতভাবে বলল, তাই থাক। বিশ্বাস কর ডাক্তার, আমি আর পারছি না। মানুষের ধৈর্য্য আর শক্তিরও একটা সীমা আছে। আমিও তো মানুষ!

আনন্দ হঠাৎ কি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। তারপর কিছুক্ষণ

চোখ বুজে থাকা স্বদেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, একটা কথা বলব স্বদেশদা ?

—বল।

আনন্দ এবার একটু সামনে ঝুঁকে এল, কিছু মনে করো না, আমার কিন্তু এখন আরো একটা জিনিষ সন্দেহ হচ্ছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে তাকাল স্বদেশ আনন্দের দিকে।

—ভিত্তিহীন একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে বসে নেই তো বৌদি ?

স্বদেশ কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু চিন্তা করে বলল, অবশ্য কথাটা এখনও ওকে জানানো হয়নি, কিন্তু সেটা যে অলীক স্বপ্ন, সে কথা তো ওর এতদিনে বোঝা উচিত।

আনন্দ বলল, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে সেটাই সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বদেশদা, আমার মনে হয়, ইটস্ হাই টাইম টু ডিসক্লোজ দি ম্যাটার। বৌদিকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বৌদি আর জীবনে মা হতে পারবে না।

—ঠাকুরপো !

একটা আর্ত্ত চীৎকারে চমকে দরজার দিকে ফিরে তাকাল ওরা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে অনু। দু'হাতে দু'কাপ চা। চোখে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, শূন্য দৃষ্টি।

কোন রকমে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল অনু, সেজন্যই কি ওকে এনে আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছিলে তোমরা? কিন্তু আমি যে—

কথাগুলো শেষ হবার আগেই মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল অনুর। হাতের কাপ ডিসগুলো ঝন্‌ঝন্ করে মেঝেতে পড়ে গেল।

দুহাতে দরজার কপাটটা শক্ত করে ধরবার চেষ্টা করল অনু। কিন্তু পারল না। ছিন্নমূল লতার মত লুটিয়ে পড়ল দরজার সামনে।

আনন্দ আর স্বদেশ দৌড়ে গেল অনুর দিকে।

বহুদিন পর পুরোন রোগের এই উপসর্গটা ফিরে এল অনুর। বহু দিন পর অনু চেতনা হারাল।

দুদিন পুরো একই ভাবে কাটল অনুর। জ্ঞান ফিরল না। আনন্দ প্রায় সারাদিনই অনুর পাশে থাকল। তাপ্তীও। বারে বারে নিজেকে আনন্দর অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। হয় তো ও জোর না করলে স্বদেশদা মেয়েটাকে নিয়ে আসত না।

সীমাও কেমন যেন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। চঞ্চল প্রাণোচ্ছল মেয়েটা সেই হারিয়ে যাবার পর থেকেই রাতারাতি যেন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। ধীর স্থির গম্ভীর হয়ে উঠেছে! কে যেন বুঝিয়ে দিয়েছে ওকে, এখানে ওর কোন দাবী নেই, অধিকার নেই। নিছক দয়ার আশ্রয় এটা। এমন কি বিড়াল দুটোর সঙ্গে পর্য্যন্ত খেলে না আজকাল মেয়েটা। প্রায় সময়ই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। ছোট্ট একটা চাপা আতঙ্ক, সংশয় জড়িয়ে থাকে চোখে।

আনন্দ মাঝে মাঝে গোপনে হেসে খেলে ওকে আবার আগের সত্তায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

চিরদিনের ধীর স্থির সংযত স্বদেশও এ ব্যাপারটায় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু চোখে মুখে চাপা উত্তেজনার ছাপ।

প্রথম দিন সারারাত নিজের ঘরে পায়চারী করেছে স্বদেশ। মাঝে মাঝে এসে দেখেছে, অনুর জ্ঞান ফিরেছে কিনা। আনন্দর সঙ্গে একবার চোখা-চোখি হতে নিজে থেকেই হঠাৎ একবার বলেছিল, সব হিসেবেই বোধহয় গোলমাল হয়ে গেল আনন্দ। চিরদিন সকলের অশান্তিই ঘটিয়ে গেলাম।

স্বদেশের ভাবগম্ভীর চোখের দিকে তাকিয়ে কোন সান্ত্বনা দেবার সাহস পায়নি আনন্দ। মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিল।

অবশ্য আনন্দর একটা অনুরোধ রেখেছিল স্বদেশ। অনুর জ্ঞান ফেরা পর্য্যন্ত সীমাকে পরানের কাছে না দেবার অনুরোধ।

কিন্তু ইতিমধ্যে পরাণ বাড়ী ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। এর ভেতর একদিন সীমাকে দেখে গেছে ও। সামান্য আলাপও করে গেছে।

সবার ঢাকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনুর অসুখের স্বরূপটাও টের

পেয়েছিল পরাণ। তাই শেষ পর্য্যন্ত একবার অধৈর্য হয়ে বলেই ফেলল ও স্বদেশকে, আমার তো মনে হয় মামাবাবু মামীমাকে টের না পাইয়ে ওকে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। জ্ঞান ফিরে ওকে দেখলে যদি আরো উত্তেজিত হয়।

পরাণ ওর অধিকারের সীমা পেরিয়ে যাওয়াতে প্রথমে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল স্বদেশ। কিন্তু ওর কথাটা মনে ধরেছিল। সত্যিইতো, যদি জ্ঞান হবার পর ওকে দেখে আরো উত্তেজিত হয়। বরং ওর উত্তেজনার উপকরণগুলো নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলা যাক। অনুর এবং সীমার দুজনেরই মঙ্গলের জন্য।

কারো সঙ্গে আলোচনা না করেই মত দিল স্বদেশ। এ সমস্যা ওর একার। সিদ্ধান্তেও আসবে ও নিজে। অন্যর পরামর্শ শুনেই আজ ও এমন যন্ত্রণাবিদ্ধ।

পরাণ অনুমতি নিয়ে গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় যেন সীমাকে নিয়ে যায়। রাতটা নিজের কাছে রেখে দেখে, খুব বেশী কাঁদাকাটা করে কিনা। হয়তো কাঁদবে না, তাপ্তীও আছে। পরদিন সকালের ট্রেনেই যেন চলে যায়। আর যেন না আসে কলকাতায়। কোনদিন না আসে।

কথামত পরদিন সন্ধ্যায়ই পরাণ এসে হাজির।

অনুর তখনও জ্ঞান হয়নি। অনুর পাশে বসে ওর নাড়ী দেখছিল আনন্দ। ওর পাশে এসে দাঁড়াল স্বদেশ। ক্লান্ত স্বরে বলল, পরাণ এসেছে আনন্দ।

চোখ তুলে তাকাল আনন্দ, নিতে এসেছে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু বৌদির এ অবস্থায়—

শ্রান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল স্বদেশ, এ অবস্থায় বিদায় করাই ভাল আনন্দ। আমি আর রিস্ক নিতে সাহস পাচ্ছি না। তুমি ওকে একটু তৈরী করে দাও।

শেষের দিকে গলাটা কেমন কেঁপে গেল স্বদেশের। আনন্দ আর প্রতিবাদ করল না। সে জোর ও হারিয়েছে।

স্বদেশ আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ব্যালকনিতে গিয়ে বসল।

বুঝল আনন্দ, এ বিসর্জনের পালাটুকু এড়িয়ে যেতে চায় স্বদেশদা। বৌদি ভাল থাকলে হয়তো বৌদিও এড়িয়ে যেতে চাইত। তাপ্তীও কি এ ভয়েই এখন অনুপস্থিত? নিজেকে মনে মনে শক্ত করে পাশের ঘরের দিকে তাকাল আনন্দ। চুপচাপ জানলায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সীমা। আনন্দ ওর পাশে গিয়ে ডাকল, সীমা।

সীমা ফিরে তাকাল।

—তোমার মার কাছে যাবে?

একটু যেন চমকে উঠল সীমা। অনেকদিন পর ছোট ছোট কিছু স্মৃতি এসে নাড়া দিচ্ছে ওকে বোঝা যায়। গভীর দৃষ্টিতে আনন্দর দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

-- যাবে?

মাথা নাড়ল সীমা, হুঁ।

—মামণির জন্য কষ্ট হবে না?

ডাগর দুটো চোখ তুলে পাশের ঘরের দিকে তাকায় সীমা। হ্যাঁ, না, কোন উত্তর দেয় না।

ওর এ বোবা কাতর দৃষ্টির দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না আনন্দ। বুকটা মুচড়ে উঠল। আস্তে চোখ নামিয়ে বলল, তোমাকে নিতে লোক এসেছে। মার কাছে নিয়ে যাবে। এস, তোমাকে সাজিয়ে দেই।

সীমা নিঃশব্দে নেমে আনন্দর সঙ্গে এগিয়ে গেল। আলনা থেকে লাল ছোট্ট জামাটা টেনে নিল আনন্দ। তারপর জুতো জোড়া নিয়ে ওকে পরিয়ে দিতে বসল।

আবেগ দমন করতে চোয়ালের হাড়দুটো শক্ত হয়ে হয়ে উঠতে লাগল আনন্দর। গলার কাছটা বন্ধ হয়ে এল। চোখে একটা জ্বালা অনুভব করতে থাকল। এই ছোট্ট কর্ত্তব্যটুকু যে এত নির্মম আগে তা বুঝতে পারেনি আনন্দ।

কোন রকমে সীমাকে জামাটা পরিয়ে দিল আনন্দ। গাল ধরে চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিল। মাথা আঁচড়ান হয়ে গেলেও ওর তুলতুলে

গাল দুটো ধরে থাকল কিছুক্ষণ। মুখটা একটু উঁচু করে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। জ্বালা করা চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে এল ওর। আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, জুতোটা নিজে পরতে পারবে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সীমা।

ওকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে যেন পালিয়ে গেল আনন্দ সামনে থেকে। স্বদেশের কাছে এসে বলল, তৈরী করে দিয়েছি। দিয়ে এস।

আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশ ঘরে এল। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখে ঘর খালি। সীমা নেই। দুজনেই একটা পুরোন ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরের দিকে গেল ওরা।

চৌকাঠের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল দুজনেই। অচৈতন্য অনুর মাথার কাছে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সীমা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অনুর মুখের দিকে।

থরথর করে কেঁপে উঠল স্বদেশের ঠোঁট দুটো। আনন্দের হাত চেপে ধরে কান্নাভাঙ্গা গলায় বলল স্বদেশ, আমাকে মাপ কর ভাই, আমি পারব না। তুমি ওকে দিয়ে এসো। এ আপদ তুমি পার করে দিয়ে এসো।

দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চলে গেল স্বদেশ। জানলার শিক দুটো মুঠ করে ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিজেকে শক্ত করে ঘরের ভেতর এগিয়ে গেল আনন্দ। কাছে গিয়ে সীমার মাথায় হাত রাখল, সীমা, এস।

সীমার চোখ দুটো জলে ভরে এল। আস্তে আস্তে আনন্দর সঙ্গে এগিয়ে এল সীমা।

সেদিন রাত্রেই জ্ঞান ফিরল অনুর। ক্লান্ত চোখ মেলে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। আনন্দ এগিয়ে এল, কাউকে খুঁজছ?

মাথা নাড়ল অনু। আবার চোখ বুজল। বড় ক্লান্ত লাগছে। আর সঙ্কোচ। প্রতিবারই এ ধরণের আক্রমণের ক্ষেত্রে অনু জ্ঞান ফেরার পর

কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করে। মানুষ নিজের কাছে নিজে পরাজিত হলে যে লজ্জা বোধ করে, সেই লজ্জা। আস্তে আস্তে সব কিছু মনে পড়ে অনুর। আর সেই কথাটা, 'বৌদিকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে বৌদি আর জীবনে মা হতে পারবে না।' কথাটা মনের উপর ভেসে বেড়াতে থাকে। পুরো চেতনা দিয়ে যেন অনুভব করতে পারে না অনু। আচমকা গভীর আঘাতের যন্ত্রণা মানুষ সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারে না। কিছু সময়ের ব্যবধানে সে যন্ত্রণা যখন অনুভূতিতে প্রবেশ করতে থাকে, তখন বুঝতে পারে কি নিদারুন সে যন্ত্রণার রূপ। শ্লথ-চেতন অনু বোধহয় সেই অন্তর্বর্ত্তী সময় সঞ্চরণ করছিল।

আনন্দ সেরাতে আর বাড়ী গেল না। অনু অবশ্য ক্ষীণ অনুরোধ জানিয়েছিল কয়েকবার ওকে বাড়ী যেতে। এবার ক'দিন পর ওর জ্ঞান ফিরল জানেনা অনু। কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে না লজ্জায়। তবু বোঝে, সে ক'টা দিন ওদের অনেক কষ্ট, অনেক উৎকণ্ঠায় কেটেছে।

আনন্দ নিজে থেকে সীমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার সাহস পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, বৌদি প্রসঙ্গটা তুললে পারে। তাহলে একবার শেষবারের মত বোঝা যায় বৌদির সত্যি মনোভাবটা। এখন তো আর বৌদির সিদ্ধান্তে আসার পথে আর কোন স্বপ্নের প্রাচীর নেই।

কিন্তু অনু সে প্রসঙ্গ তুলল না। অনু ভাবল ওর অসুখ বলে বুঝি সরিয়ে রাখা হয়েছে মেয়েটাকে। অথবা ও উত্তেজিত হতে পারে ভেবে সাময়িক ভাবে সরিয়ে দিয়েছে বাড়ী থেকে। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, আনন্দও তো বললে পারে সীমার কথাটা। ওর তো আর সঙ্কোচের কিছু নেই।

স্বদেশ মাঝে মাঝে এসে অনুকে দেখে যাচ্ছিল। আনন্দ ওর সামনে বসে থাকায় একদিক দিয়ে মনে মনে স্বস্তি বোধ করছিল। অনুর জীবনের চরম কথাটা জানবার পর অনুর যদি কোন শেষ বোঝাপরা করার থাকে, আনন্দর উপস্থিতি তাকে সাময়িকভাবে বিরত করবে। তাতে কিছুটা স্বস্তির সময় পাবে স্বদেশ। অনুর বর্ত্তমান শরীরের দিক থেকেও সেটা মঙ্গলের।

পরদিন সকলেই তাপ্তী এল। এ কদিন রোজ সকালে বাড়ী থেকে চলে এসেছে ও। সারাদিন থেকে সংসার করে দিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরেছে। অনুর জ্ঞান ফিরেছে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তাপ্তী। অনু তখনও ঘুমোচ্ছিল।

এ কদিন আনন্দ বাড়ী ফেরেনি। আজ অনুকে সুস্থ দেখে, আর তাপ্তীও চলে আসাতে বাড়ী গেল আনন্দ।

স্বদেকে ও বলে গেল, তুমিও ইচ্ছে হলে অফিস যেতে পার স্বদেশদা। তাপ্তী তো থাকছেই, আমিও কিছুক্ষণ বাদে চলে আসব। চিন্তার কিছু নেই।

স্বদেশকে সরিয়ে দেবার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল আনন্দর। স্বদেশদাকে সামনে দেখলেই হয়তো আবার কিছুটা উত্তেজিত হতে পারে বৌদি।

স্বদেশও এটাই চাইছিল। নিজের অসহায় উপস্থিতি নিয়ে অনুর নীরব নালিশের দৃষ্টির সামনে নিশ্চল বসে থাকার অস্বস্তি থেকে রেহাই পেতে চাইছিল।

ঘুম ভাঙ্গলেও ক্লান্তিতে চোখ বুজে শুয়ে ছিল অনু। তাপ্তীর আসা টের পেল অনু। আনন্দের চলে যাওয়া। তারপর স্বদেশের অফিসে বেরিয়ে যাওয়াও। তাপ্তী মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাচ্ছিল। কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

একসময় তাপ্তী নেই দেখে চোখ মেলল অনু। নতুন সূচীমুখ প্রশ্নটার মুখোমুখি বিপর্য্যস্ত মন নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল। 'বৌদি জীবনে আর মা হতে পারবে না।' নতুন করে পুরোন আশ্রয়টাকে আর ফিরে পাবে না। অথচ একথা কেন ওকে আগে বলেনি ওরা? তাহলে হয়তো জীবনটাকে অন্য দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করত ও। সমস্যাগুলোকে ভেঙ্গে চুরে অন্য সিদ্ধান্তে আসত।

তাপ্তী দূর থেকে ওকে উঠে বসতে দেখে এগিয়ে এল।—কেমন আছ মামী?

ম্লান হাসল অনু, ভাল। তোমাদের খুব কষ্ট দিলাম।

তাপ্তী ঘরের কোণে গিয়ে গ্লাসে একটা ওষুধ ঢালতে লাগল।

অনু সন্তর্পণে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। লক্ষ্য করল তাপ্তী। স্বদেশের ঘরের উপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনতে আনতে আলনাটার উপর এসে দৃষ্টিটা আটকে গেল অনুর। আলনার নিচের তাকে, যেখানে এ-কদিন সীমার ছোট ছোট ফ্রক, প্যান্টগুলো ঝুলতো, সেটা ফাঁকা। বিড়ালগুলো চুপচাপ টেবিলের নিচে বসে আছে। দরজার কোণে স্বদেশের কিনে আনা খেলনাটা দুমড়ে পড়ে আছে। কারো পায়ের নিচে পড়েছিল বোধহয়।

তাপ্তী ওষুধ নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।—কাউকে খুঁজছ ?

—তোমার মামা অফিসে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—খেয়ে গেছে তো ?

—হ্যাঁ।

ওষুধটা খাওয়া হলে গ্লাসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল তাপ্তী। আস্তে বিছানা থেকে নেমে স্বদেশের ঘরে গেল অনু। ব্যালকনির কাছটা দেখল। ফিরে এসে ভেতরের দিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল।

দুধের বাটী নিয়ে ওর পিছে এসে দাঁড়ায় তাপ্তী। প্রায় ফিসফিস করে বলে, ওকে নিয়ে গেছে।

অনু একটু চমকে ফিরে তাকায়। ছোট্ট একটা অস্বস্তি আর জিজ্ঞাসার দৃষ্টি ওর চোখে।

তাপ্তী দুধটা ওর হাতে দেয়।—আমাদের সেই পরাণ মণ্ডলকে চেন তো তুমি, সেই নিয়ে গেছে।

ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল অনু, কখন এসেছিল ?

—কাল রাত্রে। আজ দুপুরের ট্রেনে দেশে যাবে। ওদের তো কোন ছেলেমেয়ে নেই, ওখানে বেশ যত্নেই থাকবে সীমা।

কোন উত্তর দিল না অনু। ওর মুখের কোন ভাব বৈলক্ষণ বোঝা গেল না। নিজের ঘরে চলে গেল ও। বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তাপ্তী গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে রান্না ঘরে চলে গেল।

সমস্ত সকালটা একটা নতুন অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাটল অনুর। নতুন করে

আবার রাগ হল স্বদেশের উপর। সারা জীবন ধরে শাস্তি দেবার জন্যই কি ওকে এ সংসারে এনেছিল স্বদেশ। যখন বিতৃষ্ণায় সরিয়ে দিতে চেয়েছিল অনু, তখন জোর করে মেয়েটাকে ওর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। আর যখন মনকে গ্রহণের সম্মতিতে প্রস্তুত করেছে, সেই মুহূর্তেই জোর করে ওকে সরিয়ে দেওয়া হল। বেশ, তাহলে তাই হোক। জীবনের প্রতিটি শাস্তির মত এবারও মুখ বুজে সহ্য করবে ও এই নতুন শাস্তি। আত্মনিগ্রহের আগুনে নিজেকে নিঃশেষে পুড়িয়ে প্রমাণ করবে ও, আত্মত্যাগে ওর শক্তি কারো চেয়ে কম নয়। তবু ওরা ওদের সিদ্ধান্তে সুখে থাক।

সকাল কাটল। আবার সেই নিঃসঙ্গ দুপুর। নিঃশব্দ মুহূর্ত। নির্মম নির্জনতা। তাপ্তী কি করছে ও ঘরে? হয়তো ঘুমুচ্ছে। ওরা ঘুমোয়। সবাই ঘুমোয়। ও ছাড়া। ওকে জাগিয়ে রাখার কেউ নেই। বিরক্ত করার কেউ নেই। তবু ও জেগে থাকে। একটা না দেখা আগুনের আঁচ যেন ওকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে রাখে। কিন্তু সে আগুনতো ওর নিজের ভুলের আগুন নয়। অনুশোচনার উত্তাপ নয়। অন্যের দেওয়া শাস্তি। তাহলে কেন তাকে আজীবন মেনে নেবে? কেন একবার শেষবারের মত প্রতিবাদে মাথা তুলতে পারবে না? নিজের সিদ্ধান্তকে ঘোষণা নিয়ে তুলে ধরতে পারবে না?

উত্তেজনায় বিছানার উপর উঠে বসল অনু। ঘড়ির দিকে তাকাল। মনে হয় একটা সিদ্ধান্তে এল। তারপর বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। মনে মনে যাচাই করে দেখল একবার নিজের সামর্থকে। তারপর কাপড়টা ঠিক করে পরে নিয়ে পাশের ঘরে গেল।

তাপ্তী ঘুমোচ্ছে। গিয়ে ডাকল না তাপ্তীকে। ঘুমোক। কারো সাহায্য দরকার নেই ওর। ঘরে অনুকে না দেখলে ভাববে? ভাবুক। সারাজীবন অনু একাই ভেবেছে। আজ ওরাও না হয় একটু ভাবল। ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগটা বের করে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনু।

সারাটা দিন পরাণ সীমার সঙ্গে ভাব জমানর জন্ত ওকে কাধে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছে। ট্রাম বাস দেখিয়েছে। দুহাত ভরে খেলনা কিনে দিয়েছে।

সীমাও খুব বেশী গোলমাল করে নি এতক্ষণ। কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর থেকেই, লোকজনের ভীড়ে, ষ্টেশনের হৈ হট্টগোলে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছে সীমা। নতুন করে বায়না শুরু করে দিয়েছে।

—বালী দাব। মামণি দাব আমি।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুটের কৌটো খুলে দিয়েছে পরাণ।

—হ্যাঁ, যাবেই তো। দেখ কেমন পুঁ-উ ঝিক ঝিক করে বাড়ী চলে যাবে। এখন বিস্কুট খাওতো।

সমানে বক বক করেছে আর মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে পরাণ, দূর ছাই, এখনও ট্রেনটা ছাড়ছে না কেন? সময়গুলো যেন জমিদারের হাতীর মত ঢুলকি চালে চলছে কি চলছে না।

কিন্তু সময় ঠিকই নিজের গতিতে চলছিল। পরাণকে নিশ্চিন্ত করে ওয়র্নিং বেল পড়ল। শিয়ালদার বড় ঘড়ির কাটাটা একঘর করে লাফিয়ে লাফিয়ে সরতে লাগল। যাত্রীদের ওঠানামার ব্যস্ততা বাড়ল। গার্ড সাহেব হুইসিল আর পতাকা নিয়ে তৈরী হল। অনুমতির অপেক্ষায় ইঞ্জিনের যন্ত্রগুলো উন্মুখ হয়ে উঠল। পরাণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে গলা বাড়িয়ে দেখল, মাত্র এক মিনিট বাকী।

ঠিক সেই এক মিনিটের মাথায় ঝড়ের বেগে শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মের সামনে এসে একটা ট্যাক্সী থামল। দরজা খুলে দ্রুতবেগে নামল অনু। প্রচণ্ড উত্তেজনায় বুকটা ওঠানামা করছে। কোন রকমে ভাড়া মিটিয়ে পাগলের মত এগিয়ে গেল ও প্ল্যাটফর্মের দিকে। গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। দুহাতে লোক সরিয়ে এগোতে এগোতে গার্ডের বাঁশীও শুনতে পেল অনু। তীব্র হুইসেল দিয়ে গাড়ীটা নড়ে উঠল।

গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে সুরু করল অনু। চীৎকার করে ডাকতে লাগল সীমার নাম ধরে।

গাড়ীর যাত্রীরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল ওকে। কেউ কেউ মুখ বাড়িয়ে দিল। দ্রুত পায়ে একজন পুলিশ এগিয়ে এল।

একটা কামরার সামনে এসে হঠাৎ থমকে থেমে গেল অনু।

জানালার পাশেই সীমা হাত পা ছুড়ে কেঁদে চুল টেনে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে পরাণকে।

পরাণ নিরীহ মুখে কি যেন বলছে আশে পাশের লোকদের, আর শান্ত করার চেষ্টা করছে সীমাকে।

অনু চীৎকার করে ডেকে উঠল, সী-মা!

চমকে উঠল সীমা। মুহূর্ত্তে শান্ত হয়ে গেল। মুখ ঘুরাতেই দেখতে পেল অনুকে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, মামণি!

হাত বাড়িয়ে জানালা দিয়ে সামনে ঝুকে পড়ল সীমা। দুহাত বাড়িয়ে ওকে প্রায় টেনে বের করে আনল অনু। কামরার যাত্রীরা আচমকা ঘটনাটায় কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

সীমা ওর কোলে এসেই কেঁদে ফেলল, মামণি, আমি দাব না, ঐ লোকতার ছঙ্গে দাব না।

অসুস্থ শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সীমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল অনু, না, না, তোর যেতে হবে না। তোকে আর কোথাও যেতে হবে না।

এতদিন পর, এই প্রথম, নির্ভয়ে মামণিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল সীমা।